ষষ্ঠ অধ্যায়

নগর, বণিক ও বাণিজ্য

৬.১ মধ্য যুগের ভারতের শহর

শহর, নগর শব্দগুলো সবারই জানা। 'নগর' শব্দটা সংস্কৃত থেকে এসেছে। আবার 'শহর' কথাটা ফারসি। সুলতানি ও মুঘল আমলে ভারতে গ্রাম ছিল, আবার ছিল অনেক শহর বা নগর। তার কোনোটা ছিল আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কারণেও শহর গড়ে উঠত। আবার ধর্মীয় স্থান বা মন্দির-মসজিদকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল কোনো কোনো শহর। এখানে আমরা সেই শহরের ইতিকথাই জানব। কেমনভাবে তৈরি হয় শহর, কেমনভাবে তা ছড়িয়ে পড়ে। কখনও বা শহরের গুরুত্ব কমে আসে, কখনও বাড়ে। মধ্যযুগের ভারতের শহরগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি আজও আছে, তবে তাদের আকার ও প্রকৃতি অনেক বদলেছে। এই শহরগুলো বেশিরভাগ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। এর মধ্যে আমরা এখানে বেছে নিয়েছি দিল্লি শহরকে। সেই কবে থেকে ভারতের রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে দিল্লি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এর বাইরে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য শহর ছিল। যেমন, বাংলার পাণ্ডুয়া, গৌড়, নবদ্বীপ, চট্টগ্রাম, পাঞ্জাবের লাহোর, উত্তর ভারতে আগ্রা, মুঘল সম্রাট আকবরের তৈরি রাজধানী ফতেপুর সিকরি, দাক্ষিণাত্যে বুরহানপুর, গোলকোণ্ডা ও বিজাপুর এবং পশ্চিমে আহমেদাবাদ, সুরাট ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে আমরা দিল্লি শহরের কথা বিশেষ করে পড়ব।

ব্যবসা-বাণিজ্যকে ঘিরে তৈরি হওয়া আর কোনো শহরের কথা তোমরা জানো? দরকারে বাড়ির বড়োদের বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

৬.১.১ সুলতানদের রাজধানী দিল্লি : খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের গোড়া পর্যন্ত

ভৌগোলিকভাবে দিল্লির অবস্থান আরাবল্লি শৈলশিরার একটি প্রান্ত ও যমুনা নদীবিধৌত সমতলের সংযোগস্থলে। এখানে আরাবল্লির পাথর দিয়ে জমির ঢাল অনুযায়ী সুরক্ষিত দুর্গনির্মাণ করা সহজ ছিল। আবার, যমুনা নদী এখানে প্রধান জলপথ এবং শহরের পূর্ব দিকের প্রাকৃতিক সীমানা। ফলে বহু যুগ ধরেই একদিকে রাজারাজড়া, অন্যদিকে বণিকবৃন্দ এই অঞ্চলটির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

টুকরো কথা

অনেক কালের দিল্লি

দিল্লি শহরটি অনেকবার ভাঙা-গড়া হয়েছে। মহাভারতে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে একটি নগরের কথা আছে। তাকেই কেউ কেউ আধুনিক দিল্লি নগরীর আদি রূপ মনে করেন। মৌর্য শাসকদের জনৈক বংশধরের আমলে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে দিল্লির নাম পাওয়া যায়। এর অনেক কাল পরে খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে রাজপুত শাসকদের একটি গোষ্ঠী দিল্লিতে শাসন করত। তাদের হঠিয়ে চৌহান রাজপুতরা খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে দিল্লি দখল করে নেয়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে মহম্মদ ঘুরির সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আজ পর্যন্ত মধ্য যুগের দিল্লির সাতটি নাগরিক বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে।

মধ্য যুগে দিল্লি শহরের উৎপত্তি ও বিকাশের দুটি পর্যায় ছিল। একটি হলো খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের দিল্লি, অপরটি হলো সপ্তদশ শতকে মুঘল সম্রাট শাহজাহানের তৈরি শাহজাহানাবাদ। এখানে আমরা এই দুই পর্যায়ে দিল্লি শহর কেমনভাবে বদলে গেছে তার কথা পড়ব।

কুতুবউদ্দিন আইবকের আমলে দিল্লি তৈরি হয়েছিল রাজপুত শাসকদের শহর কিলা রাই পিথোরাকে কেন্দ্র করে। এটাই ছিল সুলতানি আমলের প্রথম দিল্লি বা কুতুব দিল্লি। পরবর্তী কালে গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে গিয়াসপুর নামে একটি শহরতলি তৈরি হয়েছিল যমুনার পারে। বলবনের পৌত্র কায়কোবাদ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষে যমুনার তীরে কিলোঘড়ি প্রাসাদ তৈরি করেন। জালালউদ্দিন খলজির আমলে একে ঘিরেই 'নতুন শহর' (*শহর-ই নও*) তৈরি হয়। এই শহরে আমির ও সর্দার শ্রেণির লোকেরা এসে ভিড় করে। তাদের সঙ্গে ছিল গায়ক ও বাজনাদার মানুষজন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময় মোঙ্গল আক্রমণের হাত থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সিরিতে শক্তপোক্ত কেল্লা শহর বানানো হয়েছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক অনুচরদের নিয়ে বসবাসের জন্য 'পুরোনো শহর' থেকে দূরে বানিয়েছিলেন তুঘলকাবাদ। তবে সেটি কখনই পুরোপুরি একটি রাজধানী বা বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে কুতুব দিল্লি, সিরি ও তাঁর নিজের তৈরি জাহানপনাহকে একটি প্রাচীর দিয়ে ঘিরে বৃহত্তর শহর হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সে কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়। এত কিছুর মধ্যে কিন্তু সুলতানি আমলের প্রথম দিল্লি (কুতুব দিল্লি বা পুরোনো দিল্লি) কখনই গুরুত্ব হারায়নি।

মানচিত্র ৬.১ : দিল্লির সাতটি শহর

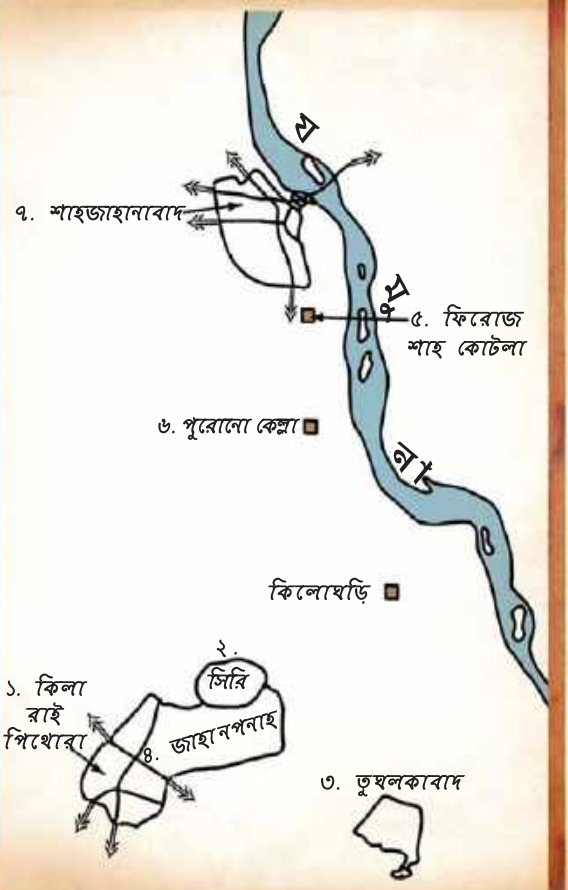

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

টুকরো কথা

ইলতুৎমিশের 'নতুন শহর'

সুলতান ইলতুৎমিশের আমলে (১২১১-'৩৬ খ্রিঃ) দিল্লি শহর গড়ে ওঠার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক ইসামি। তিনি লিখেছেন যে, প্রদীপের আলোকশিখার চারপাশে যেমন ভাবে পতঙ্গের ভিড় জমে ওঠে, তেমনি আরব, ইরান, চিন, মধ্য এশিয়া বা বাইজানটাইন থেকে অভিজাত ব্যক্তি, নানা ধরনের শিল্পী-কারিগর, চিকিৎসক, রত্ন-ব্যবসায়ী, সাধু-সন্ত সকলেই এসে ভিড় করল ইলতুৎমিশের 'নতুন শহর'-এ।

শহরের নাম	প্রতিষ্ঠাতা	রাজবংশ	সময়
১. কিলা রাই পিথোরা	পৃথ্বীরাজ	চৌহান (রাজপুত)	আনুমানিক ১১৮০ খ্রিস্টাব্দ
২. সিরি	আলাউদ্দিন খলজি	খলজি (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দ
৩. তুঘলকাবাদ	গিয়াস উদ্দিন তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩২১ খ্রিস্টাব্দ
৪. জাহানপনাহ	মহম্মদ বিন তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ
৫. ফিরোজাবাদ (ফিরোজ শাহ কোটলা)	ফিরোজ শাহ তুঘলক	তুঘলক (তুর্কি)	আনুমানিক ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৬. দীন পনাহ, শেরগাহ (পুরোনো কেল্লা)	হুমায়ুন শেরশাহ	মুঘল সুর (আফগান)	আনুমানিক ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ আনুমানিক ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ
৭. শাহজাহানাবাদ	শাহজাহান	মুঘল	আনুমানিক ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ

দিল্লিতে সুলতানি শাসন যখন একটু-একটু করে বেড়ে উঠেছে, সে সময় মধ্য এশিয়ায় এক দুর্ধর্ষ জাতি ছিল মোঙ্গলরা। এদের কথা আমরা আগেই জেনেছি। এই মোঙ্গলরা ইরাকের বাগদাদ শহরের অনেক ক্ষতি করেছিল। বাগদাদ ছিল মুসলমান সভ্যতার এক বড়ো কেন্দ্র। বাগদাদের দুরবস্থার ফলে দিল্লির গুরুত্ব বেড়ে যায়। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে অনেক লোক এসে বাস করতে শুরু করে দিল্লিতে। দিল্লি হয়ে ওঠে সুফি সাধকদের অন্যতম পীঠস্থান। এজন্য দিল্লির নামই হয়ে গিয়েছিল *হজরত-ই দিল্লি*। সুফি সাধকদের মধ্যে সেই সময়ে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া। সুফি সাধকদের কথা আমরা পড়বো সপ্তম অধ্যায়ে।

ভেবে দেখোতো এই দিল্লি শহরটি এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল কেন?

টুকরো কথা

দিল্লি এখনও অনেক দূর

দিল্লি শহর নিয়ে গল্পের শেষ নেই। এর মধ্যে একটি বিখ্যাত গল্প শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলককে (শাসনকাল ১৩২০-'২৪ খ্রিঃ) নিয়ে। একবার সুলতান গিয়াসউদ্দিন নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে শহরের বাইরে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তাতেও নিজামউদ্দিন দমে যাননি। এরপর সুলতান এক যুদ্ধযাত্রায় গেলেন বাংলাদেশে। যাওয়ার সময়ে হুকুম করলেন যে, তিনি রাজধানীতে ফেরার আগেই যেন নিজামউদ্দিন পাকাপাকিভাবে শহর ছেড়ে চলে যান। নিজামউদ্দিনের শিষ্যরা তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। নিজামউদ্দিন তাঁদের শুধু বললেন, 'হনুজ দিল্লি দূর অস্ত' (দিল্লি এখনও অনেক দূর)। যুদ্ধযাত্রা থেকে ফেরার পথে সুলতান গিয়াসউদ্দিনকে স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি একটি মঞ্চ শামিয়ানাসুদ্ধ ভেঙে পড়ে। এতে চাপা পড়ে গিয়াসউদ্দিন মারা যান। সুলতানের আর রাজধানীতে ফেরা হলো না। এই ঘটনায় দিল্লিতে নিজামউদ্দিনের জয়জয়কার ঘোষিত হলো।

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দিল্লি শহরের চেহারা বদলে যায়। আগেকার মতো আরাবল্লির পাথুরে এলাকায় শহর তৈরি না করে ফিরোজ তুঘলক যে ফিরোজাবাদ শহর গড়লেন তার মধ্যমণি ছিল ফিরোজ শাহ কোটলা। কোটলা মানে দুর্গ। এই শহর ছিল যমুনা নদীর পাড় বরাবর। এই পরিকল্পনার ফলে শহরে জলের সমস্যা মেটানো গেল। নদীপথে বয়ে আনা জিনিসপত্র শহরের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সহজ হলো ও তার জন্য খরচও কমল। সুলতানদের পুরোনো দিল্লি শহর আস্তে আস্তে ক্ষয় পেতে লাগল। ফিরোজাবাদের পত্তনের ফলে এই ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হয়েছিল কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে ফিরোজ তুঘলক দিল্লিতে শহর

পত্তনের ধাঁচটি বদলে দিয়েছিলেন। এর পর থেকে নদীর ধারেই আফগান ও মুঘলরা তাদের একাধিক কেল্লা ও শহর বানিয়েছিল।

সুলতানি আমলের দিল্লিতে অনেকগুলো বাজারের কথা জানা যায়। এখানে দেশ-বিদেশের বণিকরা নানা ধরনের পণ্য নিয়ে আসত। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পরে আরও বেশি করে জানব। **(৬.২ একক দেখো)**

দিল্লি শহরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল এর মিশ্র ধরনের বসতি। এখানে কোনো ধর্মীয় বা জাতিগত পরিচয়ের ওপর নির্ভর করে বসতি গড়ে ওঠেনি। সাধারণত একই পেশার কারিগররা জাত-ধর্ম-নির্বিশেষে কাজের টানে একসাথে একটি মহল্লায় থাকত। শহরের গড়নের মধ্যে সবসময় পরিকল্পনার ছাপ বিশেষ ছিল না। কয়েক দশক পর পর শহরের অবস্থান বদলে যাওয়ায় জাত - পাতভিত্তিক মহল্লা গড়ে ওঠার সুযোগও ছিল কম। শহরের আশেপাশে গড়ে উঠেছিল *কসবা* বা শহরতলি। এগুলোকে ছোটো শহরও বলা চলে। কসবাগুলো শহরের মতো পাঁচিলঘেরা হতো না। গ্রাম ও শহরতলির সীমানাও নির্দিষ্ট ছিল না।

দিল্লি শহরের প্রধান সমস্যা ছিল জলের অভাব। অত লোকের জন্য বর্ষার জল ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। সুলতানরা কয়েকটি *হৌজ* বা পুকুর খুঁড়ে দিলেও জলের সমস্যা থেকেই যায়। কাজেই শহর আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে থাকে যমুনা নদীর দিকে। নদী ঘন ঘন খাত পরিবর্তন করলে জলের সমস্যা আরও বেড়ে যায়। সুলতান ফিরোজ শাহ শহরে জল আনার জন্য খাল কেটেছিলেন। এ ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও শহরে জলাভাব ও স্থানাভাব দেখা দেয়।

যে এলাকায় তুমি থাকো সেখানকার বাজার-হাট কেমন? তার সঙ্গে সুলতানি ও মুঘল আমলের দিল্লির বাজারের কী কী মিল-অমিল দেখতে পাওয়া যাবে?

টুকরো কথা

সুলতানি আমলে জলসংরক্ষণ ও জল সরবরাহ

'হৌজ' বা 'তালাও' (জলাধার) ছিল দিল্লি শহরের জল সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সুশাসনের প্রতীক হিসাবে জনসাধারণের জন্য সুলতানরা জলাধার খনন করতেন ও সংস্কার করতেন। সুলতান ইলতুৎমিশ খনন করেছিল 'হৌজ-ই শামসি' বা 'হৌজ-ই সুলতানি'। আটকোণা এই জলাধারের বর্ণনা দিয়েছেন ইবন বতুতা। আলাউদ্দিন খলজি খনন করেন আরও বড়ো চারকোণা জলাধার 'হৌজ-ই আলাই'। পরে এর নাম হয় হৌজ-ই খাস। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নতুন বানানো তুঘলকাবাদে আরেকটি জলাশয় তৈরি করেন, যেখানে উঁচু বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হতো। উল্টোদিকে, সুলতানি রাষ্ট্রের বিরোধী স্থানীয় শক্তি শহরের অধিবাসীদের বিপাকে ফেলার জন্য 'হৌজ-ই শামসি'র নালাগুলোর উপর বাঁধ দিয়ে দিত। গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে মেও দস্যুদের ভয়ে শহরের লোকজন জল আনতে তালাও পর্যন্ত যেতে পারত না। ফিরোজ তুঘলক এইসব নালার ওপর তৈরি বাঁধ ভেঙে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করেন।

ছবি ৬.১ :
হৌজ-ই খাস জলাশয় (দক্ষিণ দিল্লি)। পিছনে মাদ্রাসা ও সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সমাধি সৌধ।

ভেবে দেখোতো মধ্যযুগের শহরে মাটির ওপরের জলাধারগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন? তোমার স্থানীয় অঞ্চলে পানীয় জল কীভাবে পাওয়া যায়?

দিল্লির সঙ্গে উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশের যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন পথ ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দিল্লি ও দৌলতাবাদের মধ্যে পথ বানানো হয়। কিন্তু এই সব পথের ওপর মেও এবং জাঠরা হানা দিয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দিত। সুলতানরা চেষ্টা করতেন পথগুলো খোলা রাখার।

সুলতানি শাসনের সাড়ে তিনশো বছরে দিল্লির শাসকরা এগারোবার তাঁদের শাসনকেন্দ্র বদলিয়েছেন। এর ফলে কোন জায়গাতেই স্থায়ীভাবে শহরটির ভিত মজবুত হয়নি। সুলতানদের দিল্লি মোটামুটিভাবে তিনশো বছর টিকে ছিল। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সিকান্দর লোদির সময়ে আগ্রা শহরের বিকাশ শুরু হয়। সুলতানি সাম্রাজ্যের রাজধানী চলে আসে আগ্রাতে। এরপর প্রায় একশো তিরিশ-চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে দিল্লি শহরের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে এসেছিল। যদিও সুফি সাধকদের ঐতিহ্যের কেন্দ্র হিসাবে এই শহর হিন্দুস্তানের জনজীবনে বরাবরই মর্যাদা পেয়ে এসেছিল।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর পানিপতের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে হারিয়ে আগ্রা ও দিল্লি উভয়ই দখল করেছিলেন। শেরশাহর শাসনকালে যমুনার পশ্চিমদিকে *কিলা-ই কুহনা* (পুরোনো কেল্লা) ছিল রাজধানী। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে মুঘল বাদশাহ শাহজাহানের সময়ে যমুনা নদীর পশ্চিমে শাহজাহানাবাদ নগরের পত্তন হলে দিল্লি পুনরায় রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে সরগরম হয়ে ওঠে।

টুকরো কথা

দিল্লি সুলতানি আর মুঘল সাম্রাজ্য

বিশ্বের বড়ো-বড়ো সাম্রাজ্যগুলো সাধারণত কোন একটি রাজবংশের নাম দ্বারা পরিচিত। যেমন ভারতের মৌর্য, গুপ্ত, চোল, মুঘল বা চিনের মাঞ্চু। তেমনই ইরানের সফাবি, তুরস্কের অটোমান, ইউরোপে ফ্রাঙ্ক, হ্যাপসবার্গ, রোমানভ। মেক্সিকোর আজটেক ও দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা সাম্রাজ্যগুলোও কোনো-না-কোনো রাজবংশের নামে পরিচিত। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন প্রাচীন বিশ্বে এথেন্স বা রোম শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য। তেমনই দিল্লির সুলতানি বা বিজয়নগরের সাম্রাজ্যগুলিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এইসব ক্ষেত্রে 'রোম সাম্রাজ্য' বা 'দিল্লি সুলতানি' নামটাই থেকে গেছে। দিল্লি সুলতানিতে যে রাজবংশই ক্ষমতায় আসুক না কেন শহরটির গুরুত্ব কমেনি। পরবর্তীকালে মুঘল আমলে যেমন বারবার শাসনকেন্দ্র বদলেছে, দিল্লি সুলতানিতে তা হয়নি। সবকটি শাসকবংশ দিল্লিকেই তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র বানিয়েছে।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিকেন্দ্র : আগ্রা-ফতেহপুর সিকরি-লাহোর

আকবরের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যে শাসনকেন্দ্র বারবার বদলেছে। দিল্লি সুলতানির মতো এখানে কোনো ভৌগোলিক এলাকা ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল না। মুঘল শাসক কোথায় অবস্থান করেছেন সেটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল আমলে আগ্রা, ফতেহপুর সিকরি এলাহাবাদ ও লাহোর প্রত্যেকটি শহরই ছিল অতি সুরক্ষিত, প্রায়-দুর্ভেদ্য দুর্গনগরী অথবা শাসনকেন্দ্র। শেখ সেলিম চিশতির স্মৃতিধন্য সিকরি গ্রামে আকবর তৈরি করেন নতুন রাজধানী ফতেহপুর। তবে আগ্রা দুর্গশহর হওয়ায় কখনই এর গুরুত্ব কমেনি। জলের অভাবে ফতেহপুর সিকরি ছেড়ে আকবর লাহোর চলে যান ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে। যেখান থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে নজর রাখাও বেশি সুবিধাজনক ছিল। ফের ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে আগ্রা থেকেই মুঘল শাসন পরিচালনা করা শুরু হয়।

গঙ্গা ও যমুনার সন্ধিস্থলে বানানো এলাহাবাদ দুর্গ থেকে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের ওপর নজরদারি করা যেত। রাজপুতানার আজমের ও উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু নদের পারে তৈরী আটক দুর্গ ও তার কিছুটা পূর্বদিকে রোহ্‌টাস দুর্গ ছিল অবস্থানগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই কেন্দ্রগুলোর সাহায্যে সিন্ধু-যমুনা-গঙ্গা অববাহিকার সুবিশাল, উর্বর, সমতল অঞ্চলের জনগণ, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ধনসম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যেত।

আকবরের আমলে বুন্দেলখণ্ডের প্রধান দুর্গনগরী গোয়ালিয়র, রাজপুতানার চিতোর ও রণথম্ভোর এবং দাক্ষিণাত্যের অসিরগড় দুর্গও মুঘলরা দখল করেছিল। তবে হিন্দুস্তানের (উত্তর ভারতের) দুর্গগুলোই ছিল মুঘলদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র।

৬.১.২ শাহজাহানাবাদ : মুঘল-রাজধানী : খ্রিস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক

দিল্লিতে সুলতানি আমলে যে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল তাদের থেকে খানিকটা দূরে যমুনা নদীর পশ্চিমে একটি উঁচু জায়গায় শাহজাহানাবাদ গড়ে উঠেছিল। বাদশাহ শাহজাহান সুলতানদের আমলের দিল্লি শহরের ধ্বংসাবশেষকে রাজধানী হিসাবে বেছে নেননি। তিনি একটি নতুন এলাকায় শহর পত্তন করে সার্বভৌম শাসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই শহর বানানোর সময় ইসলামি ও হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে মুঘল শাসকরা ততদিনে ভারতীয় হয়ে উঠেছিলেন।

টুকরো কথা

মুঘলদের রাজধানী বদল : আগ্রা থেকে শাহজাহানাবাদ দিল্লি

*যমুনা নদীর পাড় ভেঙে আগ্রা শহর ক্রমশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। শহরের পথঘাটও ঘিঞ্জি হয়ে পড়ে। আগ্রার প্রাসাদদুর্গ মুঘল বাদশাহের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য আর যথেষ্ট বড়ো ছিল না। তাই তৈরি করা হলো **শাহজাহানাবাদ** (শাহজাহানের শহর)। এতে ভারতের রাজনীতিতে দিল্লি শহরের যে গুরুত্ব তাকেও স্বীকার করা হলো। শাহজাহানাবাদ তৈরি হয়েছিল ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান আগ্রা থেকে সেখানে চলে আসেন।*

চাঁদনি চকের গল্প

*লালকেল্লা থেকে জাহান আরা বেগমের চক পর্যন্ত বিস্তৃত বাজারের উত্তর দিকে একটি সরাইখানা ও বাগান এবং দক্ষিণে একটি স্নানাগার তৈরি করে দিয়েছিলেন শাহজাহানের কন্যা জাহান আরা। জনশ্রুতি হলো, চাঁদনি রাতে জলে চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করত বলে ওই জায়গার নাম হয়েছে **চাঁদনি চক**। আবার, এও গল্প আছে যে ওই বাজারে সোনা-রুপোর টাকার ঝিলিকের জন্য চাঁদনি চক নামটি তৈরি হয়েছে।*

এই শহরের মুখ্য স্থাপত্যগুলো হলো লাল রঙের বেলে পাথরে তৈরি *কিলা মুবারক* (‘লালকেল্লা’ নামেই বিখ্যাত) ও জামা মসজিদ। শাহজাহানাবাদ শহরকে ঘিরে একটি খুব উঁচু ও বিরাট পাথরের পাঁচিল তৈরি করা হয়েছিল। এর গায়ে সাতাশটা বুরুজ (স্তম্ভ) ও অনেকগুলো ছোটোবড়ো দরজা বানানো হয়েছিল, যায় মধ্যে সাতটা বড়ো দরজা ছিল। বড়ো দরজাগুলো আজও আছে।

টুকরো কথা

দিল্লির লালকেল্লা

লালকেল্লার আয়তন আগ্রা দুর্গের দ্বিগুণ। এর পূর্বদিকে যমুনা নদী এবং পশ্চিমে পরিখা। দুর্গের চারটি বড়ো দরজা, দুটি ছোটো দরজা ও একুশটি বুরুজ ছিল। দুর্গের মধ্যে একভাগে ছিল রাজপরিবারের বাসস্থান, অন্য দিকে বিভিন্ন দপ্তর। সেই সময়ে ৯১ লক্ষ টাকা খরচ করে এটি বানানো হয়েছিল। দুর্গ ও শহরের মধ্যে নালা দিয়ে সেকালে জল বয়ে যেত। এই জলবাহী নালাগুলোকে বলা হতো ‘নেহর-ই বিহিশ্‌ত’ (স্বর্গের খাল)। ইসলামি রীতি অনুযায়ী এগুলোকে সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রতীক ভাবা হতো।

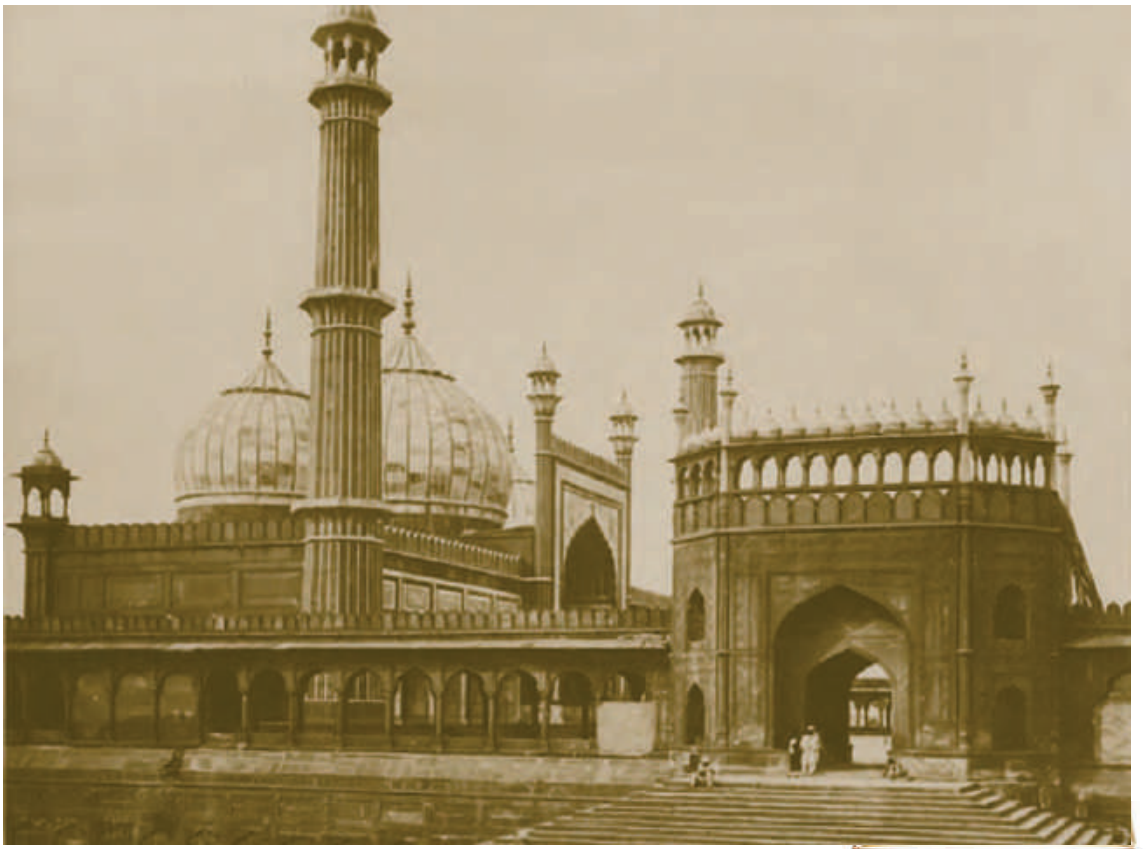

ছবি ৬.২ :
মসজিদ-ই জাহান-নুমা (জামা মসজিদ), পুরানো দিল্লি। এই ছবিটি আনুমানিক ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের একটি আলোকচিত্র।

শাহজাহানাবাদেরও নাগরিক বসতি ছিল মিশ্র প্রকৃতির। এখানে নানা শ্রেণির মানুষ বসবাস করত নানা ধরনের বাড়িতে। রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ আমিররা সুন্দর বাগানবাড়িতে থাকত। ধনী বণিকরা টালি দিয়ে সাজানো ইট ও পাথরের বাড়িতে থাকত। সাধারণ ব্যবসায়ীরা থাকত নিজেদের দোকানের ওপরে বা পেছন দিকের ঘরে। সবচেয়ে বড়ো ও সুন্দর বাড়িগুলোকে বলা হতো *হাভেলি*। এর থেকে নীচুস্তরের বাড়িকে *মকান* ও *কোঠি* বলা হতো। সবচেয়ে ছোট ঘরকে বলা হতো *কোঠরি*। এ ছাড়া ছিল আলাদা বাংলো বাড়ি। বড়ো বড়ো বাড়ির অশেপাশে মাটি ও খড় দিয়ে তৈরি বহু ছোটো ছোটো কুঁড়েঘর ছিল। এই সব কুঁড়েতে সাধারণ সৈনিক ,দাসদাসী, কারিগর প্রমুখ মানুষজন থাকত। কুঁড়েতে আগুন লেগে মাঝে-মধ্যে অনেক লোক ও গবাদি পশু মারা যেত বলে জানা যায়। তবে বসতি এলাকার মধ্যে কোনো বিভাজন ছিল না। উচ্চপদস্থ আমির ও গরিব কারিগর একই মহল্লায় পাশাপাশি থাকত। শাহজাহানাবাদের প্রধান রাজপথ ছিল দুটি। রাজপথকে *বাজার* বলা হতো, কারণ তার দু-পাশে সারিবদ্ধ দোকান ছিল।

কোনো কোনো উৎসবে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে লোক এক হয়ে পরব উদ্‌যাপন করত। যেমন দেওয়ালির সময় হিন্দু-মুসলমান একইসঙ্গে দিল্লির প্রখ্যাত সুফি সাধক শেখ নাসিরউদ্দিন 'চিরাগ-ই দিল্লি'-র (দিল্লির প্রদীপ) দরগায় আলোর উৎসব পালন করত। মহরমে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় যৌথ ভাবে অংশ নিত।

শাহজাহানাবাদ রাজধানী শহর হিসাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। তার কিছু কিছু অবশেষ আজও রয়ে গেছে। সুলতানি রাজধানীগুলোর থেকে এর আয়ু ছিল বেশি। এর থেকে মনে হয় যে শাসক হিসাবে মুঘলরাও স্থায়িত্ব অর্জন করতে পেরেছিল।

৬.২ বণিক ও বাণিজ্য

এবারে আমরা মোটামুটিভাবে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের মধ্যেকার ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা পড়ব। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের পসরা সাজিয়ে বাণিজ্য করেছে। সেকালে রেলপথ বা আকাশপথে যাতায়াতের সুযোগ ছিল না। সড়কপথ ও জলপথই ছিল যাতায়াতের মাধ্যম। এই সব পথ অনেক ক্ষেত্রে দুর্গম হতো, পথে-ঘাটে নানা রকম বিপদ-আপদের আশঙ্কাও ছিল। তা সত্ত্বেও বণিকরা দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ভারবাহী পশুর পিঠে করে, কিংবা পালতোলা নৌকা ও জাহাজে করে মালপত্র নিয়ে যেত বেচাকেনার জন্য। এই সব বণিকদের মধ্যে যেমন ভারতীয় বণিকরা ছিল, তেমন ভারতের বাইরে থেকেও অনেক ভিনদেশী বণিক ভারতে আসত বাণিজ্য করার জন্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাণিজ্যপথের ধারে,নদী কিংবা সমুদ্রের পাড়ে গড়ে উঠেছিল নানা হাট, মণ্ডি, গঞ্জ, ছোটো-বড়ো শহর।

দিল্লির সুলতানদের আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। এর নানা কারণ ছিল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে দিল্লির সুলতানরা কয়েকটি নতুন শহর তৈরি করেন বা পুরানো শহরগুলোতে নতুন করে ঘরবাড়ি তৈরি করেন। নানা ধরনের মানুষজনের আসা-যাওয়ার ফলে কেমনভাবে মধ্য যুগের ভারতে শহর গড়ে উঠেছিল তার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় তখনকার দিনের লেখাপত্রে। এই সব শহরে সুলতানরা ও তাঁদের অভিজাতরা, সৈনিকরা ও সাধারণ মানুষ বসবাস করতে শুরু করলে শহরগুলি জনবহুল হয়ে ওঠে। শহরের প্রাসাদ, মসজিদ, বাজার, রাস্তাঘাট, সরাইখানা, স্নানাগার, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি তৈরি করতে অনেক কাঁচামাল ও শ্রমিক দরকার হতো। এইসব শ্রমিকরা ছিলেন নানান জাত ও ধর্মের মানুষ। এরা কেউ ভারতীয়,কেউ বা ভারতের বাইরে থেকে আসা লোক। অনেক শ্রমিক ছিল যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হওয়া দাস।

শহরগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও বাড়ি-ঘর তৈরির কাঁচামালের জোগান দেওয়ার জন্য আমদানি-রপ্তানির বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল।

আবার, সে যুগে সুলতানরা তাঁদের সামরিক প্রয়োজনে বিরাট সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আমল থেকে এদের ভরণ-পোষণের জন্য রাষ্ট্র কৃষকদের কাছ থেকে নগদে কর আদায় করত। ওই নগদ টাকা জোগাড় করার জন্য কৃষকরা ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁদের উৎপন্ন শস্য বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতো। সেই শস্য নিয়েও বাণিজ্য চলত। তা ছাড়া, সুলতান ও অভিজাতদের বিলাস-ব্যসনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবান জিনিসের ব্যবসা সে যুগের বাণিজ্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।

৬.২.১ দেশের ভেতরের বাণিজ্য

দেশের ভিতরে সাধারণত দুই ধরনের বাণিজ্য হতো। প্রথমত, গ্রাম ও শহরের বাণিজ্য এবং দ্বিতীয়ত, দুটি শহরের মধ্যেকার বাণিজ্য। জনবহুল শহরগুলোর অধিবাসীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য গ্রাম থেকে শহরে যে সব পণ্য রপ্তানি হতো সেগুলি কমদামি জিনিস, কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে এই সব জিনিস গ্রাম থেকে শহরে আসত। এই সব জিনিসপত্রের মধ্যে থাকত নানা রকমের খাদ্যশস্য, খাবার তেল, ঘি, আনাজ, ফল, লবণ ইত্যাদি। শহরের বাজারে এইসব পণ্য বিক্রি হতো।

আবার এক শহর থেকে আরেক শহরে রপ্তানি হতো প্রধানত বেশি দামের শৌখিন জিনিসপত্র,যেগুলো ধনী,অভিজাতদের জন্যই তৈরি করত কারিগররা। এ সব জায়গায় সব জাতির ও সব ধর্মের মানুষরাই কাজ করত শিল্পী ও কারিগর হিসাবে। সুলতানদের রাজধানী দিল্লি শহরে সাম্রাজ্যের নানা এলাকা থেকে দামি মদ, সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র আমদানি করা হতো। তা ছাড়া বাংলাদেশ, করমণ্ড ল ও গুজরাতের সুতি ও রেশমের কাপড়ের চাহিদা ছিল দেশের সর্বত্র। এই যুগে প্রথম চরকায় সুতো কেটে কাপড় বোনা শুরু হয়েছিল।

সুলতানি যুগে অন্যান্য হস্তশিল্পের বাণিজ্যও হতো। এর মধ্যে ছিল চামড়া, কাঠ ও ধাতু দিয়ে তৈরি জিনিস, গালিচা ইত্যাদি। এই যুগেই ভারতে প্রথম কাগজ তৈরি করা শুরু হয়। এক সময় দেখা গেল যে, দিল্লির মিঠাইওয়ালারা কাগজের মোড়কে করে মিঠাই বিক্রি করতে শুরু করেছে।

এই সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটেছিল। রাস্তার ধারে-ধারে পথিকদের জন্য গড়ে উঠেছিল সরাইখানা। এগুলোতে পথচারী ও বণিকরা তাদের মালপত্রসহ বিশ্রাম নিত। কর আদায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার

যে সব জিনিসের কথা এখানে বলা হলো তার মধ্যে কোন কোন জিনিস এখনও কেনা-বেচা হয়?

জন্য দিল্লির সুলতানরা 'তঙ্কা' (রুপোর মুদ্রা) ও 'জিতল' (তামার মুদ্রা) নামে দু-ধরনের মুদ্রা চালু করেছিলেন। এগুলোর মান ছিল যথেষ্ট ভালো।

টুকরো কথা

টাকাকড়ির কথা

সুলতানি আমলে প্রধান মুদ্রা ছিল সোনার মোহর, রুপোর তঙ্কা ও তামার জিতল। ওই আমলের শেষদিকে উত্তর ভারতে চলত এক রকমের রুপো এবং তামা মেশানো মুদ্রা। শেরশাহ সোনা, রুপো ও তামা এই তিন রকমের মুদ্রা চালু করেন, যা পরে মুঘল সম্রাটরাও অনুসরণ করেছিল।

মুঘল আমলের সোনার মুদ্রা 'মোহর' বা 'আশরফি' নামে পরিচিত ছিল। এ যুগে প্রধান মুদ্রা ছিল রুপো দিয়ে তৈরি 'রু পায়া'। এটা দিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্য হতো প্রজারা কর দিত। এ ছাড়া ছিল তামা দিয়ে তৈরি মুদ্রা 'দাম'। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগরে সোনা দিয়ে তৈরি 'হোন' ছিল প্রধান মুদ্রা। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পরে দাক্ষিণাত্যের অন্য রাজ্যেও এই নামের মুদ্রা চালু ছিল।

৬.২.২ দেশ ও বিদেশের বাণিজ্য

ভারতে তৈরি জিনিসের চাহিদা ছিল ভারতের বাইরের নানা দেশে। বাণিজ্য হতো জলপথে ও স্থলপথে। গুজরাট ও মালাবারের (কেরালা) বন্দরগুলো থেকে পশ্চিমদিকে আরব সাগর, পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী দেশে যেত প্রধানত বস্ত্র, মশলা, নীল ও খাদ্যশস্য। সুলতানি আমলে যুদ্ধবন্দী দাসদেরও ভারত থেকে পশ্চিম এশিয়াতে রপ্তানি করা হতো। আবার, ওই সব দেশ থেকে আসত ঘোড়া, কাচের তৈরি সামগ্রী, সাটিন কাপড় ইত্যাদি। সব ভারতীয় শাসকই ঘোড়া আমদানিতে উৎসাহ দিত, কারণ ভারতে ভালো মানের ঘোড়া জন্মাত না। প্রধানত পারস্য, এডেন ও ইয়েমেন থেকে ভারতে ঘোড়ার আমদানি হতো। সুলতানি আমলে এবং মুঘল আমলের প্রথম দিকে গুজরাটের ব্রোচ ও ক্যাম্বে বন্দরদুটি এই বাণিজ্যের প্রবেশপথ ছিল। আলাউদ্দিন খলজি গুজরাট জয় করলে দিল্লি সুলতানির সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সিন্ধু প্রদেশের থেকে বিশেষ ধরনের কাপড়, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছ ওই সব দেশে রপ্তানি হতো। মুঘল আমলে সুরাট বন্দর ছিল ভারতের প্রধান বন্দর। এর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির ভালো যোগাযোগ ছিল।

পূর্বদিকে ভারতীয় সামগ্রীর চাহিদা ছিল বঙ্গোপসাগরের আশেপাশের দেশগুলিতে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। গুজরাট থেকে ওই সব দেশে যেত রঙিন কাপড়, বাংলা থেকে রপ্তানি হতো সুতির কাপড়, রেশমবস্ত্র ও চিনি। এর বিনিময়ে গুজরাটে আসত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলা। মালদ্বীপ থেকে আমদানি করা কড়ি ওই যুগে বাংলায় মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করা হতো। এই ভাবে ভারতের বিভিন্ন উপকূল থেকে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জলপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল।

সড়কপথে ভারতীয় সামগ্রীর ব্যবসা হতো প্রধানত মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে। মুলতান শহর ছিল এই বাণিজ্যের কেন্দ্র। সড়কপথে মধ্য এশিয়া থেকে মূল্যবান ধাতু যেমন সোনা, রুপো ও রত্ন আমদানি হতো। মুদ্রা তৈরিতে ওই সব মূল্যবান ধাতুর চাহিদা ছিল। তাছাড়া, অলংকারের জন্যও ঐ ধাতুগুলির চাহিদা ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া, ইরাক ও চিন থেকে আসত ব্রোকেড ও রেশম। এই পণ্যগুলি ছিল মূল্যবান এবং এর চাহিদা ছিল সমাজের উঁচুতলার মানুষের কাছে।

ভারতীয় বাণিজ্যের জগৎ

বণিক

করওয়ানি, নায়ক, বনজারা-রা শস্য পরিবহণ করে নিয়ে আসত। শাহ বা মুলতানিরা দূরপাল্লার বাণিজ্যে দক্ষ ছিল। এরা সুদের কারবারও করত। মুলতানিরা বেশির ভাগই ছিল হিন্দু, তবে মুসলমান বণিকদের কথাও জানা যায়। বড়ো-বড়ো বণিক গোষ্ঠী ছাড়াও অনেক ছোটো ফেরিওয়ালাও ছিল। এমনকি সুফি সাধকদের মধ্যেও কেউ কেউ ছোটোখাটো ব্যবসা করতেন।

সরাফ

এরা আজকের ব্যাঙ্কের মতো সেকালে টাকা বিনিময়ের কাজ করত। এরা ধাতুর মুদ্রা কতটা খাঁটি তা-ও পরীক্ষা করে দেখে নিত।

দালাল

এরা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখত, জিনিসের দাম ঠিক করে দিত।

বিমা ব্যবস্থা

ব্যবসায়ীরা দূরপাল্লার বাণিজ্যে ঝুঁকি নিয়ে পণ্য পাঠাতে পারত।

এবারে ভেবে দেখোতো যে এই বিরাট ও বিচিত্র বাণিজ্য-জগতের মানুষজন কারা ছিল? শ্রেণিকক্ষে চারজনের দল করো। এবারে ধরো তোমাদের একজন বণিক, একজন সরাফ, একজন দালাল ও একজন ক্রেতা। জিনিস কেনা-বেচা নিয়ে তোমাদের চারজনের মধ্যে কেমন কথাবার্তা হবে তা চারজনেই লিখে/অভিনয় করে দেখাও।

টুকরো কথা

হুন্ডি

*তুর্কি শাসকদের আমলে কাগজের ব্যবহার শুরু হলে সরাফরা '**হুণ্ডি**' নামে এক ধরনের কাগজ চালু করেছিল। বণিকরা কোন এক জায়গায় সরাফকে টাকা জমা নিয়ে সেই কাগজ কিনে নিয়ে অন্য জায়গায় তা প্রয়োজন মতো ভাঙয়ে নিত। এতে বণিকদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টাকা নিয়ে যাওয়ার খুব সুবিধা হয়েছিল।*

ছবি ৬.৩ :
মধ্য যুগের আফগানিস্তানের একটি বাজারে বাদাম বেচা-কেনা হচ্ছে। *বাবরনামা*-র ছবি।

টুকরো কথা

যুদ্ধ ও বাণিজ্য

মুঘল সম্রাট আকবরের আমলের একজন পোর্তুগিজ যাজক ফাদার আন্তোনিও মনসেরাট মুঘলদের একটি যুদ্ধযাত্রার বিবরণ লিখে গেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে, বিশাল আকারের মুঘল বাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্য সেনাবাহিনীর যাত্রপথের দু-ধারে সম্রাটের প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে পড়ত রসদ জোগাড় করতে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়া হতো বাহিনীর সঙ্গে চলমান বাজারে এসে জিনিসপত্র বিক্রি করে যেতে। এইভাবে, যুদ্ধযাত্রাকে কেন্দ্র করেও খাদ্য দ্রব্যের বাণিজ্য চলত মধ্যযুগের ভারতে।

মধ্যযুগে সমুদ্র বাণিজ্যে নানা দেশের বণিকরাই অংশগ্রহণ করত। ভারতীয় বণিকদের মধ্যে গুজরাটি, মালাবারি, তামিল, ওড়িয়া, তেলুগু ও বাঙালি বণিকরা সুনাম অর্জন করেছিল। এই বণিকরা ধর্মে ছিল হিন্দু, মুসলমান ও জৈন। এরা আরব, পারসিক ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করত। এদের মধ্যে কোনো কোনো বণিক ছিল খুব ধনী, তাদের বলা হতো বণিক-সম্রাট। বড়ো বড়ো ভারতীয় বণিকদের নিজস্ব জাহাজ থাকত। বাকিরা অন্যদের জাহাজে করে জিনিসপত্র পাঠাত।

টুকরো কথা

পথের হদিশ

উত্তর ভারতে গঙ্গা ও যমুনা নদী ছিল প্রধান জলপথ। আগ্রা, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা, রাজমহল, হুগলি, ঢাকা প্রভৃতি শহর নদীগুলোর মাধ্যমে যুক্ত ছিল। উত্তর-পশ্চিমে লাহোর থেকে শুরু করে দক্ষিণে সিন্ধু নদের মোহনা পর্যন্ত এলাকা জলপথে যুক্ত ছিল। উত্তর ভারত থেকে গুজরাট যাওয়ার দুটি সড়ক পথ ছিল। একটি রাজপুতানার আজমির হয়ে, অপরটি মধ্য ভারতের

বুরহানপুর হয়ে। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম তটের মধ্যে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ ছিল গুজরাটের সুরাট থেকে ঔরঙ্গাবাদ, গোলকোণ্ডা হয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে মসুলিপটনম পর্যন্ত।

মধ্য যুগে মানুষ কেমন ভাবে নানা তাগিদে দূরের পথে পাড়ি দিত তার এক চমৎকার উদাহরণ চিশতি সুফি সাধক গেসু দরাজের জীবনী। শৈশবে আরও অনেকের মত তিনিও দিল্লি থেকে চলে যান মহম্মদ বিন তুঘলকের নতুন রাজধানী দৌলতাবাদে। সাত বছর পরে ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লিতে ফিরে আসেন ও সেখানে তেষট্টি বছর ছিলেন। ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লঙ দিল্লি আক্রমণ করলে তিনি আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান।

৬.৩ ভারতে বিদেশী বণিকদের আগমন

ইউরোপ থেকে জলপথে ভারতে আসার জন্য প্রথম দিকে পোর্তুগিজরাই উৎসাহ দেখিয়েছিল। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মশলার বাণিজ্যকে দখল করা। ইউরোপে ভারতের মশলা, বিশেষ করে গোলমরিচের চাহিদা ছিল খুব বেশি। পোর্তুগিজরা ভেবেছিল যে ভারত থেকে মশলা কিনে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করতে পারলে অনেক লাভ হবে। এই ভেবে পোর্তুগালের রাজার দূত ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার দক্ষিণের উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দক্ষিণে মালাবারের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। কালিকট বন্দরটি ছিল আরব সাগরের তীরে। এর সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার বন্দরগুলোর খুব ভালো যোগাযোগ ছিল। ফলে নানা দেশের বণিকরাই এখানে আসত বাণিজ্যের টানে।

ভাস্কো দা গামা-র পরে পোর্তুগিজ নৌ-সেনাপতি ডিউক অফ আলবুকার্ক ভারতে আসেন। তিনি আরব সাগরের বাণিজ্যে আরবদের হঠিয়ে নিজেদের আধিপত্য জমাতে চান। তার হাত ধরেই গোয়ায় পোর্তুগিজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ইউরোপের বণিকরা শুধুমাত্র বাণিজ্যই করত না। তারা সমুদ্রকেও নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করত। তাদের জাহাজগুলি ছিল উন্নতমানের এবং সেগুলিতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকত। এর জোরে তারা আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। গভীর সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের ওপর নানারকম বিধি-নিষেধ চালু করার চেষ্টা করেও পোর্তুগিজরা অবশ্য বেশিদূর সফল হয়নি। এশিয়ার বণিকরা নিজেদের মধ্যে যে বাণিজ্য করত তা চলতেই লাগল। পোর্তুগিজরাই বরং কালে-কালে সেই ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে দিল।

টুকরো কথা

নতুন দেশের খোঁজে ইউরোপের মানুষরা

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইউরোপীয়রা সামুদ্রিক অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিল। তারা চাইছিল ইউরোপের বাইরে যে মহাদেশগুলো আছে সেখানে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনসম্পদ আয় করতে। এই ভাবে তারা পৌঁছায় আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে। এই সব অভিযান হতো পালতোলা জাহাজে চেপে। উৎসাহী অভিযানকারীরা ইউরোপের নানা দেশের রাজা বা অভিজাতদের সমর্থনে অভিযান শুরু করত। প্রথম দিকে স্পেন এবং পোর্তুগাল দেশের অধিবাসীরা এই সব অভিযানে ছিল খুবই সক্রিয়। তারপর ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশের বণিক ও শাসকরা এই ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

মানচিত্র ৬.২ : ভাস্কো দা গামা-র ভারত অভিযান

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

টুকরো কথা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে গড়ে উঠেছিল ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডামে তৈরি হয় হয় ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে তৈরি হয় ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

টুকরো কথা

বাংলায় বাণিজ্য কুঠি

*বাংলায় **ব্যান্ডেলে** পোর্তুগিজরা তাঁদের ঘাঁটি তৈরি করেছিল। **চুঁচুড়ায়** ডাচরা, **চন্দননগরে** ফরাসিরা, **শ্রীরামপুরে** দিনেমাররা ও **কলকাতায়** ইংরেজরা তাদের কুঠি নির্মাণ করেছিল।*

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে ইউরোপে অনেকগুলো বাণিজ্যিক কোম্পানির পত্তন ঘটে। এর মধ্যে ইংরেজ, ডাচ বা ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার প্রমুখ বণিকরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিল মুঘল আমলে। ভারতে বিদেশী বণিকদের মধ্যে ওলন্দাজরা পশ্চিম ভারতে সুরাট ও দাক্ষিণাত্যে মসুলিপটনম বন্দর এলাকায় জমিয়ে বসেছিল। মসুলিপটনমের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়েছিল কারণ দক্ষিণ ভারতের ছিট কাপড়ের খুব চাহিদা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে। অন্যদিকে সুরাট ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগরের প্রধান বন্দর। কিছুকাল পরে ডাচরা বাংলাদেশেও চলে আসে।

ইংরেজ বণিকরা প্রথমে মসুলিপটনম ও পরে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের (শাসনকাল ১৬০৩-'২৫ খ্রিঃ) দূত টমাস রো মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজসভায় এসেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় আগ্রা, পাটনা ও বুরহানপুরে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়েছিল। মুঘল বাদশাহ

শাহজাহান দাস ব্যবসা করার অপরাধে পোর্তুগিজদের হুগলি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন (১৬৩২ খ্রিঃ)। এর ফলে ওলন্দাজ,ইংরেজ ও ফরাসি বণিকরা অবাধে বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ পেয়ে যায়।

ইউরোপীয় বণিকরা ভারতীয় দালালদের মাধ্যমে কাজ করত। তারা দালালদের দাদন (অগ্রিম অর্থ বা কাঁচামাল) দিয়ে দিত, যা দিয়ে ভারতীয় কারিগররা ইউরোপীয় বণিকদের চাহিদা মতো জিনিস বানিয়ে দিত। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর যাতায়াতের ফলে বাংলাদেশের চাষিরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধান ছেড়ে আফিম ও রেশম চাষ করতে শুরু করে। এইভাবে বাজারে ফসল বেচে লাভ করার জন্য যে চাষ করা হতো তাকে বলে বাণিজ্যিক চাষ।

রেখচিত্র ৬.১ : ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য

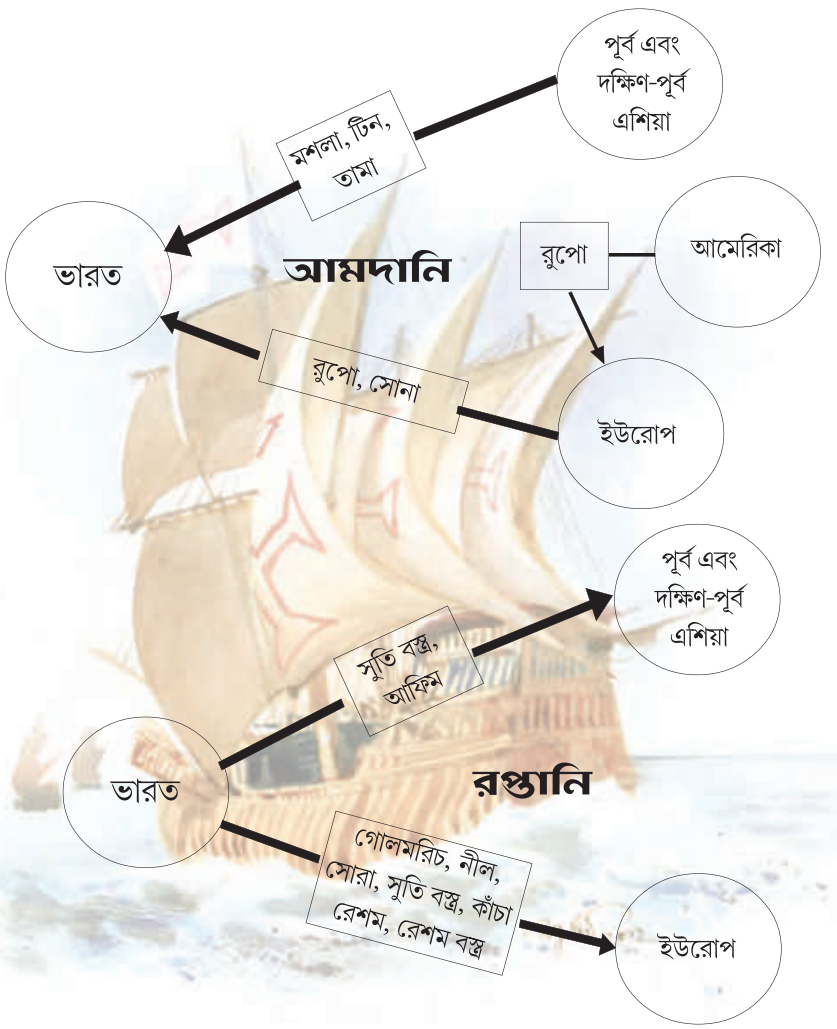

টুকরো কথা

ওলন্দাজ ও দিনেমার

নেদারল্যান্ডস দেশের লোকেদের বলা হয় ডাচ। এরা বাংলা ভাষায় ওলন্দাজ নামেও পরিচিত। ওলন্দাজ নামটি এসেছে পোর্তুগিজ শব্দ হলান্দেজ থেকে। নেদারল্যান্ডস দেশটি হল্যান্ড নামেও পরিচিত। দিনেমার বলতে ডেনমার্কের লোকেদের বোঝানো হয়।

ইউরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলি আস্তে আস্তে নানা ঘাঁটি বানাতে শুরু করে। কোম্পানির কুঠিতে ইউরোপীয় বণিকরা নিজেদের মতো করে বাড়িঘর করত। কুঠিগুলো তারা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দুর্গের মতো সুরক্ষিত করে রাখত। এখানে তাদের বাসগৃহ ও মালের গুদাম থাকত। নিজেদের জাহাজে করে তারা ইউরোপে মাল পাঠাত। ভারতীয় জাহাজের তুলনায় ইউরোপীয়দের জাহাজ আকারে বড়ো হতো এবং সেগুলি গভীর সমুদ্রে নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিল।

এইভাবে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের ভারতে গুজরাট, উত্তর ও দক্ষিণ করমণ্ডল এবং বাংলা হয়ে উঠেছিল ইউরোপীয় বণিকদের প্রধান অঞ্চল। এই চারটি অঞ্চলে যথাক্রমে সুরাট, মসুলিপটনম, পুলিকট এবং হুগলি ছিল ইউরোপীয়দের প্রধান বাণিজ্যঘাঁটি। এইসব অঞ্চলের কারিগররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত সেখানকার গ্রামগুলিতে। করমণ্ডলের গ্রামগুলোতে সুতো-কাটুনি, তাঁতি, কাপড় ধোলাই এবং রং করার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল চাষিদের থেকে অনেক বেশি।

মুঘল শাসকরা বাণিজ্য করতে বণিকদের উৎসাহ দিত। মালের ওপর শুল্ক ছাড় দিয়ে, কুঠি বানানোর অনুমতি দিয়ে তারা বণিকদের সুবিধা করে দিত। মুঘল অভিজাতদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি বাণিজ্য করত। তবে এই প্রয়াস ছিল খুবই সীমিত। মুঘল সম্রাটরা, রাজপুত্ররা ও অভিজাতরা নিজেদের প্রয়োজনে ও শখ মেটাতে নিজেদের কারখানায় কারিগরদের দিয়ে নানা ধরনের শৌখিন জিনিস, অস্ত্র, বিলাসদ্রব্য তৈরি করাতো। কিন্তু সেগুলো কখনই বাণিজ্যের স্বার্থে তৈরি হয়নি। তাই ইউরোপে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যকে ভিত্তি করে অর্থনীতি এগিয়ে চলল, ভারতে তখনও কৃষিই ছিল অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি।

৬.৩ মানচিত্রটি ভালো করে দেখো। কোন কোন বিদেশি বণিক কোম্পানি কোথায় কোথায় ঘাঁটি তৈরি করেছিল, তার একটা তালিকা তৈরি করো।

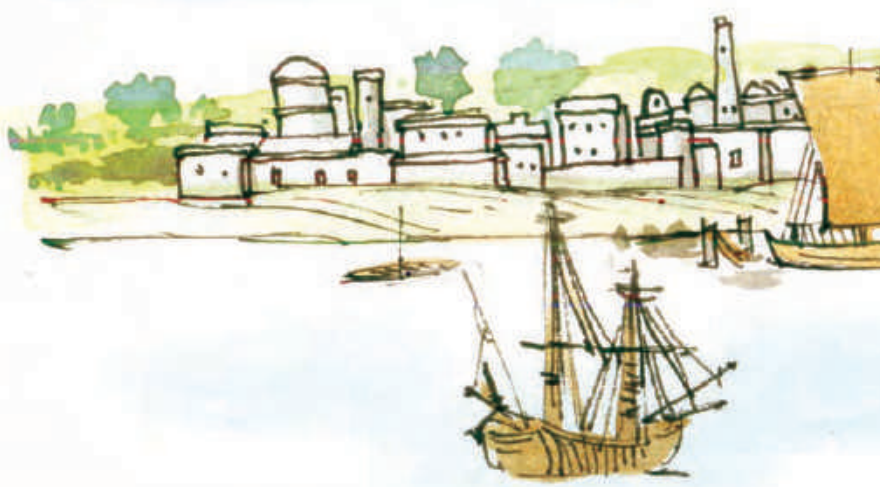

মানচিত্র ৬.৩ : খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের ভারতে কয়েকটি বিদেশি ঘাঁটি

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও:

(ক) শাহজাহানাবাদ, তুঘলকাবাদ, কিলা রাই পিথোরা, দৌলতাবাদ।

(খ) তঙ্কা, মোহর, হুণ্ডি, জিতল।

(গ) নীল, গোলমরিচ, সুতি বস্ত্র, রুপো।

(ঘ) করওয়ানি, কসবা, বনজারা, মুলতানি।

(ঙ) পাণ্ডুয়া, বুরহানপুর, চট্টগ্রাম, গৌড়।

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

'ক' স্তম্ভ	*'খ' স্তম্ভ*
সিরি	ডেনমার্কের অধিবাসী
দিনেমার	শেখ নাসিরউদ্দিন
সরাফ	আলাউদ্দিন খলজি
হৌজ	মুদ্রা বিনিময়কারী
চিরাগ-ই দিল্লি	জল সংরক্ষণ

৩। সংক্ষেপে (৩০-৩৫ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) কী কী ভাবে মধ্য যুগের ভারতে শহর গড়ে উঠত?

(খ) কেন সুলতানদের সময়কার পুরোনো দিল্লির আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়েছিল?

(গ) কেন, কোথায় শাহজাহানাবাদ শহরটি গড়ে উঠেছিল?

(ঘ) ইউরোপীয় কোম্পানির কুঠিগুলি কেমন ছিল?

(ঙ) মুঘল শাসকরা কীভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে দিল্লি কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হয়ে উঠেছিল?

(খ) শাহজাহানাবাদের নাগরিক চরিত্র কেমন ছিল?

(গ) দিল্লির সুলতানদের আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার কেন ঘটেছিল?

(ঘ) মধ্য যুগে ভারতে দেশের ভেতরে বাণিজ্যের ধরনগুলি কেমন ছিল তা লেখো।

(ঙ) ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির আমদানি-রপ্তানির রেখচিত্র দেখে ওই যুগের বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হয়?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) তুমি যদি সুলতানি আমলে দিল্লির একজন বাসিন্দা হও তাহলে কী কী ভাবে তুমি দৈনন্দিন প্রয়োজনে জল পেতে পারো?

(খ) মনে করো তুমি একটি ইউরোপীয় কোম্পানির ব্যবসায়ী। ব্যবসার প্রয়োজনে তোমাকে বোম্বাই থেকে সুরাট হয়ে আগ্রার মুঘল দরবারে যেতে হচ্ছে। তুমি কোন পথে যেতে পারো? এঁকে দেখাও।

(গ) খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় বঙ্গোপসাগরে ভাগীরথীর মোহনা থেকে তুমি ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে যাচ্ছ। পথে তুমি কোথায় কোথায় ইউরোপীয় কুঠি দেখতে পাবে, তা মানচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

তুলো ধোনা, সুতো রং করা এবং কাপড় তৈরি

মাছ ধরা এবং পাখি ধরা

মুঘল শিল্পীদের চোখে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার কয়েকটি দিক

আগ্রার দুর্গ নির্মাণ (১)

আগ্রার দুর্গ নির্মাণ (২)

সপ্তম অধ্যায়

জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি

সুলতানি ও মুঘল যুগ

৭.১ জীবনযাত্রা

সুলতান, বাদশাহ, রাজা-উজিররা দেশ শাসন করেন। তাঁদের কথা লেখা থাকে নানা বইতে। কিন্তু, দেশের অগণিত সাধারণ গরিব মানুষের কথা বিশেষ কিছু বলা থাকে না। অথচ সেই গরিব জনগণের চাষ-বাস, শিল্প থেকে যে টাকা আয় হয় তাতে রাজা-বাদশাহের শাসন চলে। তাহলে দেখা যেতে পারে কেমন ছিল সাধারণ মানুষের জীবন সুলতানি এবং মুঘল যুগে।

দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামেই বাস করতেন। স্থানীয় চাহিদা মেটানোই ছিল চাষের প্রধান কাজ। নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় তুলনায় বড়ো শিল্প দেখা যেত। কাঁচামাল আমদানি এবং তৈরি মাল রপ্তানির সুবিধার জন্য নদীর ধারে শিল্পগুলি তৈরি করা হতো। বাংলা এবং গুজরাটে এই সুবিধা থাকায় সেখানে শিল্পাঞ্চল ছিল। দেশের শাসকরা চাষির ফসলের একটা মোটা অংশে ভাগ বসাত। তার বদলে সাধারণ লোকের শান্তিতে বাস করার ব্যবস্থা করে দিত প্রশাসন।

গাঙ্গেয় সমভূমিতে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে আমের সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল। আঙুর, খেজুর, জাম, কলা, কাঁঠাল, নারকেল প্রভৃতি ফলেরও চাষ হতো। নানা রকম ফুল, চন্দনকাঠ, ঘৃতকুমারী এবং নানা ভেষজ উদ্ভিদ ভারতে হতো। লঙ্কা, আদা এবং অন্যান্য মশলাও চাষ হতো। আর ছিল নানান গৃহপালিত পশুপাখি।

কৃষি-পণ্যকে ভিত্তি করে গ্রামে কারিগরী শিল্প চলত। চিনি এবং নানান সুগন্ধি আতর তৈরির শিল্প ছিল বিখ্যাত। এই শিল্পগুলি বংশগত ছিল। তাই পুরোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেও শিল্পদ্রব্যগুলির মান হতো অসাধারণ।

এই সময়ে চালু শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, ধাতুর কাজ, পাথরের কাজ, কাগজ শিল্প প্রভৃতি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাজমিস্ত্রি এবং পাথরের কাজে পটু কারিগরদের চাহিদা ছিল সর্বত্র। টালি ও ইটের ব্যবহার করে বাড়ি বানানোর পদ্ধতি চালু হয়েছিল বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলে।

রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সবসময়ে সমান ছিল না। দেশে দুর্ভিক্ষ বা যুদ্ধ লাগলে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ত। আবার জিনিসপত্রের খুব

১১২ নং পৃষ্ঠার ছবিগুলি ভালো করে দেখো। ছবিগুলিতে কারা কী কী কাজ করছে?

কম দামের নজির ছিল ইব্রাহিম লোদির রাজত্বকাল। একটা বহলোলি মুদ্রা (সুলতান বহলোল লোদির আমলে চালু) দিয়ে লোকে দশ মণ খাদ্যশস্য, পাঁচ সের তেল এবং দশ গজ মোটা কাপড় কিনতে পারত।

আলাউদ্দিন খলজি এবং মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে পণ্যদ্রব্যের দামের তুলনা করলে কি কোনো তফাত দেখা যাবে?

টুকরো কথা

প্রতি মণের দাম জিতলের হিসাবে

পণ্যদ্রব্য	আলাউদ্দিন খলজি	মহম্মদ বিন তুঘলক	ফিরোজ শাহ তুঘলক
গম	৭½	১২	৮
যব	৪	৮	৪
ধান	৫	১৪	—
ডাল	৫	—	৪
মসুর	৩	৪	৪
চিনি	১০০	৮০	—
ভেড়ার মাংস	১০	৬৪	—
ঘি	১৬	—	১০০

শোনা যায় মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে বাংলায় নাকি জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব সস্তা। ইবন বতুতা বাংলায় জিনিসপত্রের দামের একটা তালিকা দিয়েছেন—

একটি মুরগি	১ জিতল
পনেরোটি পায়রা	৮ জিতল
একটি ভেড়া	১৬ জিতল
তিরিশ হাত লম্বা খুব ভালো কাপড়	২ তঙ্কা
চাল (প্রতি মণ)	৮ জিতল
একটি ছাগল	৩ তঙ্কা
চিনি (প্রতি মণ)	৩২ জিতল

সমাজ ছিল যৌথ পরিবারভিত্তিক। সমাজে এবং পরিবারে পুরুষদের তুলনায় নারীর স্থান ছিল নীচে। হিন্দু এবং মুসলমান সমাজে ঘোমটা এবং পর্দার প্রচলন ছিল। কিন্তু গরিব কৃষক পরিবারে, নারী-পুরুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার এবং খামারে পরিশ্রম করতে হতো। সেই সব ক্ষেত্রে মহিলাদের পর্দা বা ঘোমটার বিশেষ প্রচলন ছিল না।

সাধারণ গরিব জনগণের বসতির জন্য সামান্য কিছু উপকরণ লাগত। একটা পাতকুয়া, ডোবা বা পুকুর থাকলেই বসতি তৈরি করে নিতে পারত গ্রামের মানুষ। ঘর তোলার জন্য কয়েকটি গাছের গুঁড়ি, চাল ছাইবার জন্য কিছু খড়। এতেই তারা মাথা গোঁজবার ঠাঁই করে নিত।

সরকারি খাজনা ও নানা পাওনা মিটিয়ে ফসলের কিছু অংশ কৃষকের হাতে থাকত। সেটাই ছিল রোজকার ব্যবহারের সম্বল। বছরের কয়েকটি ঋতুতে কৃষক পরিবারগুলি দিন-রাত পরিশ্রম করত। কৃষকের দৈনন্দিন জীবন বিষয়ে অল্প তথ্য পাওয়া যায়। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময়ের একজন ওলন্দাজ বণিক লিখেছেন যে, গরিবরা মাংসের স্বাদ প্রায় জানতই না। তাদের রোজের খাবার ছিল একঘেয়ে খিচুড়ি। তাই দিয়েই সারাদিনে একবার মাত্র বিকেলবেলায় তারা খালি পেট ভরাত। পরবার পোশাকও যথেষ্ট ছিল না। একজোড়া খাটিয়া ও রান্নার দু-একখানা বাসনই ছিল তাদের ঘর-গৃহস্থালি। বিছানার চাদর ছিল একটি বা বড়ো জোর দুটি। তাই তারা পেতে শুতো, দরকারে গায়ে দিত। গরমের দিনে তা যথেষ্ট হলেও দারুণ শীতে তাদের ভীষণই কষ্ট হতো। পালা-পার্বণে আনন্দ-উৎসব ছিল একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম।

অন্যদিকে ভেবে দেখো, মুঘল সম্রাটরা ছিলেন অত্যন্ত ধনী। তাদের অভিজাতরা প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিলেন। দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও তাজমহলের মতো স্থাপত্য নির্মাণের জন্য তারা বিপুল অর্থ খরচ করতেন। দামি পোশাক, অলংকার, নানা রকম বিলাস দ্রব্যের জন্য টাকা খরচ করতে তারা দু-বার ভাবতেন না।

সে যুগের খেলাধুলোর মধ্যে কুস্তি ছিল একটি জনপ্রিয় খেলা। অভিজাত, সাধারণ জনগণ এমনকী সাধু-সন্তরাও কুস্তির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তির-ধনুক, বর্শা ছোঁড়া ও সাঁতার জনপ্রিয় ছিল। বাংলায় বাঁটুল ছোঁড়া নামের একরকম খেলার কথা জানা যায়। লোকগান, নাচ, বাজিকর বা জাদুকরের খেলা, সং প্রভৃতি ছিল সাধারণ মানুষের আনন্দের উপকরণ।

দিল্লিতে এবং আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে শাসকের বদল ঘটেছে নানা সময়ে। কিন্তু, সুলতানি ও মুঘল যুগে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রায় একই রয়ে গেছে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর অভাবের সংসার — সেযুগে ভারতের গরিব কৃষক, কারিগর, শ্রমিকের জীবন বলতে এটুকুই।

? এর থেকে তুমি সেযুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে কী ধারণা করতে পারো?

টুকরো কথা

সেকালের সময় মাপা

দিন-রাতের সময় বোঝার জন্য সমস্ত দিন-রাত কে আটটি 'প্রহর' (ফারসিতে 'পাস')-এ ভাগ করা হতো। একেকটি প্রহর আজকের হিসাবে প্রায় তিনঘন্টা। আটটি প্রহর আবার ষাটটি 'ঘড়ি'তে (ঘটিকা) বিভক্ত ছিল। এক ঘড়ি সমান আজকের চব্বিশ মিনিট। প্রতিটি ঘড়ি আবার ষাটটি 'পল'-এ ভাগ করা ছিল। এইভাবে দিনরাত্রি মিলিয়ে হতো তিনহাজার ছশো পল। প্রহর ও ঘড়ির যথাযথ সময় বুঝে নেওয়া যেত পাঁজির সাহায্যে। জলঘড়ি দেখে সময় নির্ধারণ করা হতো। প্রধান শহরগুলিতে ঘন্টার আওয়াজ করে সময় কতো হলো তা জানান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে এই কাজের জন্য আলাদা একটা দফতরই ছিল।

জীবন-জীবিকার নানা রকম : সুলতানি ও মুঘল যুগ

৭.২ নতুন লোকায়ত ধর্মীয় ভাবনা: ভক্তি ও সুফিবাদ

মধ্যযুগের ভারতে জীবনযাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল ধর্ম। ভারতে সুলতানি আমলে ধর্ম নিয়ে নতুন কিছু ভাবনার কথা শোনা যায়। পুরোনো আমলের ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম তখনও কায়েম ছিল। কিন্তু মানুষের মনের উপরে তাদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসছিল। এই অবস্থায় ভক্তিবাদ ও সুফিবাদের কথা শোনা যেতে থাকে। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্কের উপর এই ধর্মপ্রচারকরা জোর দেন। এইরকমের চিন্তাধারা ছিল প্রথাগত ধর্মমতের একেবারে বাইরে।

ভক্তিবাদ

ভক্তিবাদের মূলে ছিল ভগবানের প্রতি ভক্তের ভালবাসা বা ভক্তি। এই ভক্তির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। একটি হলো ভগবানের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা। অন্যটি হলো ঈশ্বরলাভের জন্য জ্ঞান বা যোগ ছেড়ে ভক্তের ভক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যই প্রথমে দক্ষিণ ভারত এবং পরে উত্তর ভারতের ভক্তিবাদের মূল কথা হয়ে ওঠে।

ভক্তিবাদের উত্থানের কারণ কী ছিল? খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক নাগাদ উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের পতনের পরে কয়েকজন রাজপুত রাজা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। এদের সমর্থন করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা। তখন রাজপুত এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাইরে নতুন কোনো ধর্মভাবনা তখনকার উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেনি। তবে সে সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু কিছু মানুষ ভক্তি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল। নাথপন্থী, যোগী ইত্যাদি ধর্মীয় গোষ্ঠীরা এর প্রমাণ। তাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিতি পেয়েছিল দক্ষিণ ভারতের অলভার এবং নায়নার (বহুবচনে নায়নমার) সাধকরা। উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ার আগেই খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ায় দক্ষিণ ভারতে এই সাধকদের হাত ধরেই ভক্তিবাদ জনপ্রিয় হয়েছিল।

ঐ সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম মানুষের জীবনে অচল হয়ে পড়েছিল। কারণ এই ধর্মমতগুলি অযথা রীতিনীতির উপর জোর দিত বা চূড়ান্তভাবে অ-সাংসারিক জীবনযাপন করতে বলত। এতে না ছিল মানুষের আবেগের জায়গা, না ভালো থাকার চাবিকাঠি।

এরকম অবস্থায় সরল, সোজা তামিল ভাষায় নিজের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জানায় অলভার এবং নায়নার সাধকরা। এতে আকৃষ্ট হয় সাধারণ

মনে রেখো

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণেরা বিভিন্নভাবে সমাজের অন্যান্য শ্রেণিদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের উপর নানা নিষেধ আরোপ করত। অব্রাহ্মণদের না ছিল পবিত্র ধর্মীয়গ্রন্থ পাঠের স্বাধীনতা, না সমানভাবে মন্দিরে যাওয়ার অধিকার। অন্য জাতি বা বর্ণের মধ্যে একসঙ্গে খাওয়া বা বিয়ে করাও নিষিদ্ধ ছিল।

মানুষ। ক্রমে অবশ্য দক্ষিণের এই ভক্তিবাদও বাইরের রীতিনীতি এবং দেবতাপুজোকে বেশি প্রাধান্য দিতে থাকে। এর ফলে তারাও মানুষের থেকে দূরে সরে যায়। দক্ষিণের ভক্তিবাদ কখনোই সমাজে ব্রাহ্মণদের গুরুত্বকে খাটো করার ক্ষমতা রাখত না।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে দক্ষিণ থেকে ভক্তির এই ধারা পশ্চিম ভারত হয়ে ক্রমশ উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় তুর্কিরা উত্তর ভারত আক্রমণ করে। তাদের কাছে হেরে যাওয়ায় রাজপুত রাজাদের ক্ষমতা কমে আসে। তার সঙ্গেই কমে যায় তখনকার সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে ব্রাহ্মণদের দাপট। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে নামদেব, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামানন্দ, কবীর, নানক, শঙ্করদেব, চৈতন্যদেব, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তিবাদের প্রচার শুরু করেন। ভারতবর্ষের নানাদিকে শোনা যেতে থাকে তাঁদের কথা, লেখা, কবিতা এবং গান।

ছবি ৭.১ : গুরু নানক

টুকরো কথা

গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ)

গুরু নানক ছিলেন মধ্যযুগের ভক্তি সাধকদের মধ্যে অন্যতম। কোনোরকম ভেদাভেদ না মেনে সমস্ত মানুষকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সময়েই চালু হয় লঙ্গরখানা। সেখানে এক সঙ্গে সব ধরনের মানুষরাই খেতে বসতো। এটি শিখ গুরুদ্বারে বা ধর্মীয় স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। নানক নিজে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে যাননি। তবে তাঁর দর্শন এবং বাণীর উপর নির্ভর করেই পরবর্তী কালে গড়ে ওঠে শিখ ধর্ম। এই ধর্মে দশজন গুরুর কথা বলা রয়েছে যাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন গুরু নানক। এঁদের বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে। তার নাম গুরুগ্রন্থসাহিব। এটি গুরমুখি লিপিতে লেখা।

তবে এই সাধকদের ভক্তিচিন্তাধারায় যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু এঁদের সবার ভক্তি দর্শনের মূল কথা ছিল দুটি। একটি হলো কোনো ভেদাভেদ না করে সব মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেওয়া। অন্যটি হলো সমস্ত আচার ছেড়ে ভগবানকে নিজের মতো করে পাওয়া। এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটির এক উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন সাধিকা মীরাবাঈ (১৪৯৮-১৫৪৪খ্রিঃ)। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে রাজস্থানের একটি ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম ও মেওয়াড়ের শাসককুলে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি তাঁর সাধিকা জীবনের অনেকটা সময়েই কাটিয়েছিলেন গুজরাটের দ্বারকায়। তিনি কখনোই সাংসারিক বন্ধনের মধ্যে আটকে থাকেননি। মীরাবাঈ তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বা গিরিধারীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিতে।

মীরাবাঈ রচিত পাঁচশোরও বেশী ভক্তিগীতি ভারতীয় সংগীত এবং সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তেমনই একটি ভক্তিগীতি হলো—

‘মেরে তো গিরিধর গোপাল
দুসরা না কোঈ,
যাকে শির মোর মুকুট
মেরে পতি সোঈ...’

—আমার প্রভু গিরিধর গোপাল ছাড়া আর কেউ নয়। যাঁর শিরে (মাথায়) ময়ূরের পাখার মুকুট তিনিই যে আমার পতি।

মীরাবাঈয়ের উদাহরণ থেকে তোমরা কিন্তু ভেবে বসো না যে, তখনকার ভক্তিবাদে কেবল তথাকথিত উঁচুজাতের মানুষরাই বিশ্বাস করত। সাধকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তথাকথিত নীচুজাতির। যেমন, সন্ত রামানন্দের শিষ্যদের মধ্যে ছিল জাতিতে চামার রবিদাস, নাপিত সাই বা কসাই সাধনা।

ছবি ৭.২ : মীরাবাঈ

টুকরো কথা

কবীর (১৪৪০-১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ)

বারাণসীতে এক মুসলিম জোলাহা (তাঁতি) পরিবারে পালিত হন কবীর। তিনি ছিলেন খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের একজন বিখ্যাত ভক্তিসাধক। কেউ কেউ মনে করেন যে কবীর ছিলেন রামানন্দের একজন শিষ্য। ইসলামের একেশ্বরবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব, নাথ-যোগী এবং তান্ত্রিক বিশ্বাসও এসে মিশেছিল কবীরের ভক্তিচিন্তায়। তাঁর কাছে সব ধর্মই ছিল এক, সব ভগবানই সমান। তাই কবীরের মতে রাম, হরি, গোবিন্দ, আল্লাহ, সাঁই, সাহিব ইত্যাদি ছিল এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন নাম। কবীর বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ তার ভক্তি দিয়ে নিজের মনেই ঈশ্বর খুঁজে পাবে। তার জন্য মন্দিরে-মসজিদে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই মূর্তি পুজো বা গঙ্গাস্নান বা নামাজ পড়া তাঁর কাছে ছিল অর্থহীন। তখনকার সামাজিক জীবনে কবীরের ভাবনার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাঁর গান এবং দোহা শুনলে বোঝা যায় তিনি ধর্মের লোক-দেখানো আচারের বিরোধী ছিলেন।

হিন্দি ভাষায় দুই পংক্তির কবিতাকে বলে দোহা। কবীরের একটি দোহা হলো :

*‘জৈসে তিল মেঁ তেল হ্যায়
জিয়ু চক্‌মক্ মেঁ আগ
তেরা সাঁই তুঝ মেঁ হ্যায়,
তু জাগ সকে তো জাগ...’*

ছবি ৭.৩ : কবীর

—তিলের মধ্যে যেমন তেল আছে, চক্‌মকি্ পাথরের মধ্যে যেমন আছে আগুন, তেমনি তোর ভগবান (সাঁই) তোর মধ্যে আছে। যদি ক্ষমতা থাকে তো জেগে ওঠ।

পাঁচশোরও বেশি কবীরের দোহা গুরুগ্রন্থসাহিবের অংশ। শিখ এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের কাছে কবীরের আসন দশজন শিখগুরুর পাশেই। কবীরের দোহার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়ার কথা শুনত সাধারণ মানুষ। কারখানার মজুর, চাষি, গ্রামের মোড়ল— সবার মুখের ভাষাই ছিল দোহার ভাষা।

লোকমুখে শোনা যায় যে, কবীরের মৃত্যুর পর তাঁর হিন্দু এবং মুসলিম ভক্তরা কবীরকে হিন্দু মতে দাহ করা হবে না কি ইসলামীয় মতে গোর দেওয়া হবে তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে। সে সময় কবীরের দেহ অদৃশ্য হয়। সেই জায়গায় পাওয়া যায় সাদা কাপড়ের উপর এক মুঠো লাল গোলাপ। এই ফুল দুই সম্প্রদায়ের ভক্তরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। গল্পের সত্য-মিথ্যা বিচার না করেও আমরা বুঝি কিভাবে তখনকার মানুষের মনে কবীর শান্তি এবং সাম্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

ছবি ৭.৪ :
গুরু নানক এবং কবীরের মধ্যে কাল্পনিক আলাপের দৃশ্য। এর থেকে বোঝা যায় যে শিখরা সন্ত কবীরকে শ্রদ্ধা করত।

গুরুনানক ও কবীরের কথা সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারতেন। এর পিছনে কী কী কারণ ছিল বলে তোমার মনে হয়?

সুফিবাদ

নিজের মতো করে ভগবানকে ডাকার ইচ্ছা কিন্তু হিন্দুধর্মের মানুষদের বা বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যেই সীমিত ছিল না। খ্রিস্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় আইন কানুনের বাইরে বহু মুসলমান ঈশ্বরকে নিজের মতো করে আরাধনা করার পথ খুঁজছিলেন। সুফিসন্তরা তাদেরকে এই পথ দেখায়।

সুফিদের আর্বিভাব মধ্য এশিয়ায়। আন্দাজ খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক থেকে তাঁরা ভারতে আসতে থাকে। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ দেশে সুফিবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেকের মতে, সুফি কথাটি আসে *সুফ* থেকে যার অর্থ আরবিতে পশমের তৈরি এক টুকরো কাপড়। বিশ্বাস করা হয় যে, এরকম কম্বল জাতীয় জিনিস গায়ে দিতেন সুফি সাধকরা, খ্রিস্টান সন্তরা এবং সন্ন্যাসীরা।

ভারতের মাটিতে সুফিবাদ যখন দানা বাঁধছিল সে সময়ে ভক্তিবাদ ছাড়াও নাথপন্থী ও যোগীরা তাদের ধর্ম প্রচার করেছিল। এই সবকটিই তখনকার প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলির আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে ছিল। তাই আন্দাজ করা যায় যে সুফি, ভক্তি এবং নাথপন্থী ধর্মীয় ধারণা একে অন্যকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন মনে করা হয়, সুফিরা যে হঠযোগ অভ্যাস করত, তা তারা জেনেছিল নাথপন্থীদের কাছ থেকে। এ দেশে মূলত দুটি গোষ্ঠীর সুফিরা ছিল প্রভাবশালী। দিল্লি ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে চিশতি এবং সিন্ধু, পাঞ্জাব ও মুলতানে সুহরাবর্দিরা। ভারতে চিশতি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মইনউদ্দিন চিশতি। শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া বা বখতিয়ার কাকি ছিলেন এই গোষ্ঠী বা সিলসিলার অন্যতম সাধক। চিশতি সুফিদের জীবন ছিল খোলামেলা। তাঁরা ধর্ম, অর্থ, ক্ষমতার মাপকাঠিতে মানুষকে বিচার করতেন না।

টুকরো কথা

পির ও মুরিদ

অনান্য বেশ কয়েকটি সহজিয়া ধারার মতো সুফিও ছিল একটি সাধন ধারা। সুফি সিলসিলাগুলির প্রধান ব্যক্তি হতেন কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ সাধক। তিনি তার শিষ্যদের সঙ্গে থাকতেন 'খানকা'য় বা আশ্রমে। সুফি ধারায় পির বা গুরু এবং মুরিদ অর্থাৎ শিষ্যের সম্পর্ক ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিররা তাঁদের ধর্মভাবনা ও দর্শন দিয়ে যেতেন বেছে নেওয়া খলিফা বা উত্তরাধি-কারীদের। সেটাই ছিল নিয়ম।

ছবি ৭.৫ : সুফি সাধক শেখ সেলিম চিশতির দরগা, ফতেহপুর সিকরি, উত্তরপ্রদেশ।

ছবি ৭.৬ :
দরবেশ সাধকরা সাধনার জন্য একসঙ্গে জমায়েত হয়েছেন।

টুকরো কথা

বা-শরা ও বে-শরা

সুফিরা ছিল প্রধানত দুই প্রকারের। 'বা-শরা' অর্থাৎ যারা ইসলামীয় আইন (শরা) মেনে চলত। এবং 'বে-শরা'— অর্থাৎ সেই সুফিরা যারা এই আইন মানতো না। ভারতে দুই মতাদর্শেরই সুফিরা ছিল। যাযাবর সুফি সম্প্রদায় কালানদার ছিল বে-শরা। চিশতি এবং সুহরাবর্দিরা ছিল বা-শরা।

টুকরো কথা

সুফিদের জনপ্রিয়তা

সুফি সাধক কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি দিল্লিতে চিশতি মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এতে রেগে যায় গোঁড়া উলেমার দল এবং সুহরাবর্দিরা। কাকির বিরুদ্ধে আভিযোগ আনা হয় যে তিনি অ-ইসলামীয় আচার-আচরণ করেন। যেমন, তিনি 'সমা' বা সুফি 'কীর্তন' গান করেন। এর প্রতিবাদে বখতিয়ার কাকি যখন দিল্লি ছেড়ে শহরের বাইরে বেরোন, তখন নাকি হাজার হাজার মানুষ তাঁর সঙ্গে বহুদূর চলে আসেন। এই দেখে বখতিয়ার কাকি দিল্লি ফেরার সিদ্ধান্ত নেন।

চিশতি সুফিরা রাজনীতি এবং রাজদরবার থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাজ্য পরিচালনার কাজে জড়িয়ে পড়লে কোনোভাবেই ঈশ্বরসাধনা সম্ভব নয়। অন্যদিকে সুহরাবর্দি সুফিরা অনেকেই দারিদ্র্যের বদলে আরামের জীবন বেছে নিয়েছিল। সুলতানের কাছ থেকে উপহার বা সাহায্য নিতে বা রাজ্যে ধর্মীয় উচ্চপদ গ্রহণ করতে সুহরাবর্দিদের কোনো সংকোচ হতো না। সুহরাবর্দি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বদরউদ্দিন জাকারিয়া এক সময় সুলতান ইলতুৎমিশের পক্ষ নেন।

তবে চিশতি হোক বা সুহরাবর্দি, মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজে এই সব সুফি সাধকদের অবদান ছিল প্রচুর। নিজেদের খোলামেলা জীবন এবং শান্তির বাণীর মধ্য দিয়ে তারা সর্বদা চেষ্টা করতেন সব মানুষকে এক সঙ্গে রাখতে। সুলতানি শাসনে বাস করা অ-মুসলমান মানুষরা সুফিদের এরকম মানবদরদী কথায় অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেন। সহজিয়া ধর্ম (এ সম্পর্কে তোমরা আগে পড়েছো), ভক্তি, সুফি এবং আরো কিছু ধর্মমত তখনকার মানুষের কাছে একটা সরল বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। তারা বোঝাতে পেরেছিল যে, ঈশ্বরলাভের উপায় একমাত্র মনের ভক্তি দিয়ে আরাধনা করা। সংস্কৃতির উপরেও এই ভক্তিসাধক এবং সুফিসন্তরা নিজেদের ছাপ রেখেছিল। এর প্রমাণ ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। দোহা, কবিতা, কীর্তন এবং নানান নৃত্যশৈলীতে (যেমন, মণিপুরী নৃত্য) সেই ছাপ আজও খুঁজে পাওয়া যায়।

৭.৩ শ্রীচৈতন্য ও বাংলায় ভক্তিবাদ : সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে প্রভাব

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রচার এবং প্রসার জোরদার হয় শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর সঙ্গীদের চেষ্টায়। বাংলায়, বিশেষত রাঢ় বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম আগে থেকেই ছিল। শ্রীচৈতন্য সেই বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য আর ভক্তিবাদের ভাবনাকে একাকার করে দেন। জাত-ধর্ম-বর্ণ এসব ভেদাভেদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ভক্তির প্রচার একটা আন্দোলন হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নবদ্বীপ ছিল এই ধর্ম-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। কেমন ছিল সেই সময়ের নবদ্বীপ? নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে অব্রাহ্মণরাই সংখ্যায় বেশি ছিলেন। গ্রামের ছবিটি একই রকম ছিল।

ভেবে বলো

বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে, চৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বিভিন্ন পাড়ায় বাস করত। তাদের জীবিকা ছিল নানারকম। শাঁখারি, মালাকার, তাঁতি, গোয়ালা, গন্ধবণিক, তাম্বুলি, বাদ্যকর, সাপেকাটার চিকিৎসক, বণিকপ্রভৃতি।

তখনকার নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থা আর শ্রীচৈতন্যের ভেদাভেদহীন ভক্তি প্রচার— এই দুয়ের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়?

চৈতন্যের জন্মের অনেক আগে থেকেই বাংলায় তুর্কি আক্রমণের ফলে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। হোসেনশাহি রাজত্বে শাসনকাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব কমে কায়স্থদের প্রতিপত্তি বেড়েছিল। তার পাশাপাশি শাসক-আমলাদের অত্যাচারও ছিল। এইসব অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির উত্তর প্রচলিত হিন্দুধর্মে খুঁজে পায়নি সাধারণ গরিব মানুষ। ফলে, অনেকেই হিন্দু ধর্ম ছেড়ে তুলনায় উদার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। এর পাশাপাশি, আগে থেকেই নানান ধর্ম ও বিশ্বাস সমাজে চালু ছিল। আকর্ষণ ছিল তান্ত্রিক সাধনার প্রতিও। মনসা, চণ্ডী, ধর্ম—এই তিন লৌকিক দেবদেবীর পূজোর চল ছিল।

তবে নবদ্বীপের পরিবেশে ভক্তিবাদের প্রচার সহজ ছিল না। ব্রাহ্মণ 'ভট্টাচার্য'-রা বৈষ্ণবদের প্রবল বিরোধিতা করত। ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণবদের উপহাস করত।

শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা মাত্র একটি সামাজিক নীতি মেনে চলায় জোর দিয়েছিলেন। সেই নীতিকেই *ভক্তি* বলা হয়েছে। ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত। তার জন্য কোনো উদ্যোগ-আয়োজন লাগে না। সাধারণ জীবনযাপন এবং সহজসরল আচরণের উপরেই গুরুত্ব দিতেন শ্রীচৈতন্য। এতে কোনো আড়ম্বরের জায়গা ছিল না। চৈতন্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বৈষ্ণব ভক্তির জনপ্রিয়তা বেড়েছিল।

টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের ছবি

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত বইয়ের প্রমাণ ধরলে চৈতন্যের জন্ম ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

চৈতন্যের ছবি নানা জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু ঠিক কেমন দেখতে ছিল চৈতন্যকে শুধু লিখিত প্রমাণ আছে তার। তাও সেই লেখা অনেক পরের। ফলে, চৈতন্যের যে ছবি আজ দেখা যায়, চৈতন্য আসলে তেমন দেখতে ছিলেন কি না, তা জানা যায় না। গৌতম বুদ্ধ বা যিশু খ্রিস্টের ছবির ক্ষেত্রেও একই রকম কথা বলা যায়।

ভেবে বলো

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন—

"নীচ জাতি হৈলে নহে ভজনে অযোগ্য।
যেই ভজে সেই বড়ো অভক্ত হীন ছাড়।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতকুলাদি বিচার।।"

এর থেকে জাতপাতের প্রতি বৈষ্ণব-ভক্তি আন্দোলনের কীরকম দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পাওয়া যায়?

চৈতন্যের বৈষ্ণব ভক্তি প্রচার এবং প্রসারের একটা পরিকল্পিত কাঠামো দেখা যায়। যেমন—

- চৈতন্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে যে বৈষ্ণবগোষ্ঠী সংগঠিত হয় তাতে জাতবিচার ছিল না।
- চৈতন্য ঘরে ঘরে নামগান প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তার সঙ্গে বিশাল শোভাযাত্রা করে নগরকীর্তনের ব্যবস্থা করেন।
- চৈতন্য নিজে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হলেও, বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং তথাকথিত নীচু জাতির মানুষদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন।
- কোনো প্রচলিত লোকধর্মের বিরোধিতা চৈতন্য করেননি। ভক্তি প্রচারকেই একমাত্র ধর্ম হিসাবে তুলে ধরেননি।
- নবদ্বীপে প্রভাবশালী জগাই-মাধাইয়ের অত্যাচারের বিরোধিতা করেন চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামী নিত্যানন্দ। পাশাপাশি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের প্রতিবাদ করেন তিনি। আবার কীর্তন-বিরোধী নবদ্বীপের কাজিকেও তর্কে হারিয়ে দেন। এভাবেই হিন্দু-মুসলমান শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেন চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা।
- চৈতন্য বৈষ্ণবীয় নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ নেন। নিজে তাতে অভিনয়ও করেন।
- ভক্তি সাধকরা সবাই জনগণের মুখের ভাষাতে প্রচার করতেন। চৈতন্যও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বাংলা ভাষাতেই তিনি ভক্তি প্রচার করেন।

টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের আহার

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পরে প্রায় উপোস করে দিন কাটাতেন। ভক্তরাই মাঝে মধ্যে নানা রকম রান্না করে তাঁকে খাওয়াতে চাইতেন। এমনই এক খাওয়ার বিবরণ বেশ মজার। শাক, মুগের ডাল, বেশি করে ঘি-মাখা ভাত, পটোল ও অন্যান্য সবজির তরকারি, কচি নিমপাতা ভাজা, বেগুন, মোচার ঘন্ট, নারকেল, ঘন করে জাল দেওয়া দুধ, পায়েস, চাঁপাকলা, দই-দুধ দিয়ে চিঁড়ে আরও নানা কিছু। মজার ব্যাপার তরকারি রান্নায় বড়ির ব্যবহার হতো। আর আলুর ব্যবহার হতো না।

তবে চৈতন্য নিজে এত কিছু খেতেন না, ভক্ত এবং অনুচরদের খাওয়াতেন। কীর্তনিয়াদেরও খাওয়াতেন। আবার ক্ষুধার্ত মানুষদের ডেকে এনেও খাওয়াতেন। কখনওবা তিনি ভক্তদের সঙ্গে বনভোজনে যেতেন এমন কথাও শোনা যায়।

এই বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল কী ছিল?

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলায় ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব কমতে থাকে। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অনুগামীরা জাতিভেদ না মানলেও সমাজে ভেদাভেদ থেকেই গিয়েছিল।

সবরকম ভেদাভেদ পুরো দূর করতে না পারলেও, সেগুলিকে তুচ্ছ করা যায়— একথা চৈতন্য জোর দিয়েই প্রচার করেন। সেকালের তুলনায় ভাবলে এইটিই এক বড়ো সাফল্য ছিল। তবে চৈতন্য এবং তাঁর ভক্তি আন্দোলনের সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়েছিল বাংলার সংস্কৃতিতে **(৭.৭.২ একক দেখো)**।

টুকরো কথা

কীর্তন

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের আগেও কীর্তন গান ছিল। চৈতন্য সেই কীর্তনগানকে জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। চৈতন্য দু-রকমের কীর্তন সংগঠিত করেন। নামকীর্তন ও নগরকীর্তন। নামকীর্তন ঘরে বসেই গাওয়া যেত। নগরকীর্তন নগরে শোভাযাত্রা করে ঘুরে ঘুরে গাওয়া হতো। কীর্তনে জাতবিচার ছিল না। নেচে নেচে, দু-হাত তুলে গান গেয়ে চলাই কীর্তনের বৈশিষ্ট্য ছিল। নামকীর্তন গাওয়া সবার পক্ষেই সম্ভব ছিল। কবি পরমানন্দ লিখেছিলেন—

" নাচিতে জানি না তবু নাচিয়া গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে জানি না তবু গাই।''

কীর্তন ছাড়া কথকথার মাধ্যমেও ভক্তির ভাব প্রচার করা হতো।

বৈষ্ণবদের রচনায় সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনের ছবিই ধরা পড়ে। বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণবগান-কবিতা লেখেন। ঘাঁটু, ঘাঁটু-তেলেনা, পটুয়া, রাসলীলা, পৌষ-পার্বণ ইত্যাদির গানে আজও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ করা যায়।

এভাবেই ভক্তির ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন শ্রীচৈতন্য। বাংলায় এক নতুন সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ তৈরি হয় এর মধ্য দিয়ে। জ্ঞানের বদলে ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভের উপরে জোর পড়েছিল।

বলা হতো : ''জ্ঞানে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই। কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোঁসাই।'' অর্থাৎ জ্ঞানচর্চা বা উঁচুবংশে জন্ম দিয়ে কিছু হয় না। ভক্তির মাধ্যমেই চৈতন্য লাভ হয়।

টুকরো কথা

শ্রীচৈতন্যের জীবনী

শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করেই বাংলা ভাষায় জীবনী সাহিত্য লেখার ধারা বিকশিত হয়েছিল। চৈতন্যের জীবনীগুলির থেকে একদিকে সমকালীন সমাজ এবং অন্যদিকে ব্যক্তি চৈতন্যের বিষয়ে আমরা নানা কথা জানতে পারি।

ভেবে বলো তো, কেন শ্রীচৈতন্যকে দিয়েই বাংলায় জীবনী সাহিত্যের ধারা বিকশিত হয়েছিল?

টুকরো কথা

উত্তর-পূর্ব ভারতে ভক্তি আন্দোলন

ভক্তি আন্দোলনের একটি ধারা বিকশিত হয়েছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমে। এর নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। তিনি ছিলেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মানুষ। এক কায়স্থ ভুঁইয়া পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ভাগবত পুরাণের এক অংশ তিনি অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং কৃষ্ণের উপাসক। তাঁর প্রচারিত ভক্তির মূল কথা ছিল 'নাম ধর্ম'। তিনি তাঁর অনুগামীদের কৃষ্ণের নাম গান ও সংকীর্তন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে তিনি রাধাকৃষ্ণের কাহিনির উপরে জোর না দিয়ে কৃষ্ণের বাল্যলীলাকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শঙ্করদেব ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। অনেক জায়গায় তিনি 'সত্র' (বৈষ্ণব ভক্তদের জমায়েত হওয়ার স্থান) গড়ে তুলেছিলেন। এর মধ্যে থাকত 'নাম ঘর' এবং 'কীর্তন ঘর'। তাঁর প্রচারিত ভক্তি ব্রহ্মপুত্র নদের দু-পাড়ে বসবাসকারী কৃষক, ছোটো ব্যবসায়ীদের মতো সমাজের নীচু তলার মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মূল সমস্যার কথা ধরা পড়ত এর মধ্যে। পরের শতকে ভক্তি আন্দোলনের ভিত অসমে আরও শক্ত হয়েছিল। ঐ সময়ে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় কয়েকটি পরিবর্তন ঘটেছিল। অহোম রাজারা মুঘলদের সঙ্গে লড়াই করে অসমকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। কৃষিক্ষেত্রে ধান চাষের বিস্তার অর্থনীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই সময়ে শঙ্করদেবের ভক্তির আদর্শ অসমের সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মাধবদেব এবং দামোদরদেব ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

ছবি ৭.৭ : শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে বৈষ্ণবদের নগর সংকীর্তন।

৭.৪ দীন-ই ইলাহি

খ্রিস্টীয় ১৫৭০-এর দশকে বাদশাহ আকবর ক্রমশ সবার সামনে নামাজ পড়া ও অন্যান্য ইসলামীয় আচার পালন করা বন্ধ করে দেন। এর বদলে তিনি নিজের পছন্দ মতো কিছু প্রথা পালন করতে শুরু করেন। এক সময়ে দিনে চারবার তিনি সবার সামনে পূর্বদিকে মুখ করে সূর্যপ্রণাম করা এবং সূর্যের নাম জপ করা শুরু করেন। ফতেহপুর সিকরি তে তিনি প্রথমে ইসলাম ধর্ম নিয়ে উলেমার সঙ্গে আলোচনা করতেন। পরে তিনি নানান ধর্মের গুরুদের ডেকে ধর্মীয় নানা বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। অবশেষে এইসব আলোচনার ভিত্তিতে তিনি দীন-ই ইলাহি নামে এক নতুন মতাদর্শ চালু করলেন।

এক সময়ে ভাবা হতো দীন-ই ইলাহি বুঝিবা বাদশাহ আকবরের প্রচলিত এক নতুন ধর্ম। কিন্তু, আকবর কখনো ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেননি। ইসলাম ধর্মের নানা ব্যাখ্যার মধ্যে থেকে তিনি সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য মতটি মেনে নিতেন। নানা ধর্মের গুরুদের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি বিভিন্ন ধর্ম থেকে নিজের পছন্দ মতো কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বেছে নিতেন। সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে আকবর দীন-ই ইলাহি তৈরি করেন। তিনি এর প্রচলন করেছিলেন নিজের সভাসদদের মধ্যে। কিন্তু, এখন এই সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা পালটে গেছে। এখন মনে করা হয় যে, দীন-ই ইলাহি আসলে ছিল আকবরের প্রতি চূড়ান্ত অনুগত কয়েকজন অভিজাতদের মধ্যে প্রচারিত এক আদর্শ। আকবর নিজে তাঁদের বেছে নিতেন। বেশ কিছু অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির মধ্যে দিয়ে তাঁরা বাদশাহের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকার শপথ নিত। এই হলো দীন-ই ইলাহি।

এইভাবে, আকবর নিজের চারপাশে গড়ে তুললেন বিশ্বস্ত অনুগামীদের একটি দল। একেকজন সদস্যের ছিল একেক ধর্ম। তাঁরা কেউ পারস্যদেশের লোক, কেউ হিন্দু রাজপুত, আবার কেউ বা ভারতীয় মুসলমান। দীন-ই ইলাহি কোনো আলাদা ধর্ম ছিল না।

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গিরও দীন-ই ইলাহি চালু রাখেন। তাঁর এক সেনাপতি মির্জা নাথান, যিনি বাংলা ও আসামে বহুকাল যুদ্ধ করেন, 'ইলাহি'-তে নিজের দীক্ষিত হওয়ার ঘটনার কথা লিখে গিয়েছেন নিজের আত্মজীবনীতে।

টুকরো কথা

টমাস রো-এর বিবরণে দীন-ই ইলাহি

মুঘল রাজসভায় আসা প্রথম ইংরেজ দূত টমাস রো-কেও সম্ভবত জাহাঙ্গির দীন-ই ইলাহিতে শামিল করেন। ভিনদেশ থেকে আসা দূতটি কিছু না জেনেই দীন-ই ইলাহি-তে প্রবেশ করার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ফেলেন। টমাস রো-এর লেখায় তাঁর সঙ্গে বাদশাহের এই মুহূর্তটির একটি মজার বিবরণ পাওয়া যায় :

টুকরো কথা

দীন-ই ইলাহির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান

যিনি দীন-ই ইলাহি গ্রহণ করতেন, তিনি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরুতে তার জীবন (জান), সম্পত্তি (মাল), ধর্ম (দীন) ও সম্মান (নামুস) বিসর্জন (কুরবান) দেওয়ার শপথ নিতেন। শিষ্য (মুরিদ) যেমন তার সুফি গুরুর (পির) পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, তাঁকেও তেমনই বাদশাহের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে হতো। এরপর অনুষ্ঠান শেষ হলে বাদশাহ তাকে দিতেন একটি নতুন পাগড়ি, সূর্যের একটি পদক ও পাগড়ির সামনে লাগাবার জন্য তাঁর (বাদশাহের) নিজের ছোটো একটি ছবি।

টমাস রো-র বিবরণ পড়ে বাদশাহ জাহাঙ্গিরের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয়?

আমি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমি ঢোকামাত্র তিনি... আসফ খানকে একটি সোনার হার দিলেন। হারটিতে সোনার জলে আঁকা বাদশাহের নিজের একটি ছবি ও একটি মুক্তো লাগানো ছিল। তিনি আসফ খানকে নির্দেশ দিলেন যে [তিনি যেন হারটি আমাকে দেন, তবে] আমি যেটুকু সম্মান তাঁকে দেখাতে চাই, তার বেশি যেন তিনি আমার থেকে দাবি না করেন। এদেশের প্রথা অনুযায়ী বাদশাহ কাউকে কিছু দিলে সেই লোকটিকে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে সম্মান জানাতে হয়।... এরপর আসফ খান হারটি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলে আমি হাত বাড়িয়ে সেটি নিতে গেলাম; কিন্তু তিনি ইশারায় আমাকে আমার টুপি খুলতে বললেন। [টুপি খোলার পর] আমার গলায় হারটি পরিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে বাদশাহের সামনে নিয়ে গেলেন। আমার কী করণীয় বুঝতে পারলাম না, তবে সন্দেহ হলো যে, তিনি চান যে আমি ও দেশের প্রথা অনুযায়ী সিজদা করি [অর্থাৎ ঐভাবে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বাদশাহকে সম্মান দেখাই]। কিন্তু আমি তা না করে আমার আনা উপঢৌকন বাদশাহকে এগিয়ে দিলাম। আসফ খান আমাকে বাদশাহকে ধন্যবাদ জানাতে নির্দেশ দিলেন। আমি আমার নিজের দেশের প্রথা মেনে ধন্যবাদ জানালাম। তাই দেখে কয়েকজন সভাসদ আমাকে সিজদা করতে বললেন, কিন্তু বাদশাহ ফারসিতে তাঁদের জোর করতে নিষেধ করলেন। আমাকে তিনি নানা কথা বলে ফেরত পাঠালেন; আমি এরপর নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

এখানে মনে রেখো যে, তাঁর আগের বেশিরভাগ সুলতান বা বাদশাহের থেকে আকবরের রাজত্বের ধর্মীয় চরিত্র ছিল আলাদা। গোঁড়া ইসলামের ছায়া থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন ১৫৭০-এর দশক নাগাদ। মৌলবি বা উলেমার কথামতো তিনি রাজ্য চালাতে চাননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষে বহু ধর্ম এবং জাতির মানুষের বসবাস। সেখানে নিজের শাসন সুদৃঢ় করতে গেলে কোনো একটি ধর্মের বুলি আউড়ালে চলবে না। নিজেকে এবং নিজের শাসনকে সবার কাছে মান্য করে তুলতে গেলে বিভিন্ন ধর্ম থেকে নানা আচার-প্রথা গ্রহণ করতে হবে। এই বোধ থেকেই আকবর সূর্যপ্রণাম, সূর্যের নাম জপ, প্রাসাদের *ঝরোখা* (জানালা) থেকে সভাসদ এবং প্রজাদের দর্শন দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রথা চালু করেন। দীন-ই ইলাহির প্রথাগুলি ইসলামের রক্ষণশীল ব্যাখ্যাকারদের চোখে ছিল 'ইসলামবিরোধী'। কিন্তু, এই প্রথাগুলির মাধ্যমে আকবর ইসলামের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে রাজপুত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছেও নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন।

৭.৫ সুলতানি ও মুঘল স্থাপত্য

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তর ভারতে দিল্লি সুলতানি শাসন শুরু হয়। সুলতানরা দিল্লি আর অন্য নানা জায়গায় অনেক স্থাপত্য তৈরি করেন। ঘর-বাড়ি, প্রাসাদ, মিনার , মন্দির-মসজিদ এসবকে স্থাপত্য বলে। এগুলি বানানোর কারিগরিকে স্থাপত্য শিল্প বলা হয়।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের অনেক আগেই ভারতে আরবি স্থাপত্যের চিহ্ন রয়েছে। দিল্লি সুলতানির আগে তৈরি মসজিদের ভাঙা অংশের খোঁজ পাওয়া গেছে গুজরাটে। এর থেকে বোঝা যায় ইসলামীয় স্থাপত্যশিল্প ভারতে সুলতানির আগেই এসেছিল। এই স্থাপত্যের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল খিলান এবং গম্বুজ।

তবে সুলতানি শাসন জারি হওয়ার পরেই ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্প মিলেমিশে যেতে পেরেছিল। এই দুই শিল্পধারা মিশেই তৈরি হয় ইন্দো-ইসলামীয় শিল্পরীতি। সুলতানরা যে দেশের শাসক, তারা যে ক্ষমতাবান সেটা বোঝানোর দরকার ছিল। আর তাই তারা বড়ো বড়ো স্থাপত্য বানান। সুলতানরাও সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ধর্মচর্চার জন্য মসজিদ, মিনার, পড়াশোনার জন্য মাদ্রাসা, থাকার জন্য প্রাসাদ, দুর্গ এসব বানানো শুরু হলো। সুলতানরা বা তাঁর আত্মীয় বা অভিজাত কেউ মারা গেলে তাদের স্মৃতিতে সৌধ, মিনার বানানো হতো। মাঝে মধ্যে সুলতানরা নিজেদের জীবনকালেই নিজেদের সমাধি সৌধের মূল কাঠামোটি তৈরি করে রাখতেন। সব স্থাপত্যের গায়েই লেগেছিল শিল্পের ছোঁয়া। সুন্দর কারুকার্যে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল স্থাপত্যগুলি।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়ের পর কুতুবউদ্দিন আইবক কুয়াত-উল ইসলাম মসজিদ বানাতে শুরু করলেন। এদেশের লোক যাতে তাঁকে শাসক বলে মেনে নেয় তার জন্য এটি দরকার ছিল। আশপাশের সাতাশটি হিন্দু এবং জৈন মন্দিরের ভাঙা অংশ এই মসজিদ বানানোর কাজে ব্যবহার হয়। তাই এই মসজিদে হিন্দু, জৈন এবং ইসলামীয় স্থাপত্য শিল্পের মিলমিশ নজর টানে। এই মসজিদের মিনারটি হলো কুতুব মিনার। এই মিনার সুলতানি শাসনের প্রতীক হয়ে উঠল। কুতুবউদ্দিন মারা যাওয়ার পর মিনারটি বানানোর কাজ শেষ করেন সুলতান ইলতুৎমিশ। ইলতুৎমিশের নিজের জন্য বানানো সমাধি সৌধটি এই যুগের আরেকটি চমৎকার স্থাপত্য।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজির আমলে তৈরি হয় আলাই দরওয়াজা। এটি ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যশিল্পের অসাধারণ নমুনা। লাল বেলে পাথরের তৈরি এই ‘দরওয়াজা’ যেন সুলতান হিসাবে আলাউদ্দিনের ক্ষমতার প্রতিফলন

ছিল। দরওয়াজার গায়ে আল্লাহ্-র কথা নয়, খোদাই করা হয়েছিল সুলতানের প্রশংসা। এমন কাজের নমুনা সে যুগে বিরল। এটিও ছিল ওই কুতুব-চত্বরেই। কুতুব মিনার, ইলতুৎমিশের সমাধি, আলাই দরওয়াজা—সব মিলিয়ে কুতুব-চত্বর হয়ে উঠল সুলতানি স্থাপত্যের নজির।

তুঘলক সুলতানরা নগর বা শহরের পরিকল্পনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের দৌলতাবাদের দুর্গ-শহরে তেমন পরিকল্পনার ছাপ দেখা যায়। ফিরোজ শাহ তুঘলকের ফিরোজাবাদও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাধি সৌধ বানানোর প্রতিও তুঘলক সুলতানরা মনোযোগী ছিলেন। যেমন, দিল্লির তুঘলকাবাদে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধি। খাড়া দেয়ালের বদলে গম্বুজ-বসানো ঢালু দেয়াল ছিল এর বৈশিষ্ট্য।

ইন্দো-ইসলামীয় স্থাপত্যরীতিতে লোদি সুলতানদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল আটকোণা সমাধি সৌধগুলি। চওড়া বাগানঘেরা চত্বরে এই সমাধি সৌধগুলি তৈরি করা হয়েছিল। চত্বরগুলির প্রবেশ পথে তৈরি করা হয়েছিল বড়ো দরওয়াজা।

অতএব, মুঘলরা যখন ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তার আগেই দিল্লি সহ ভারতের নানা অঞ্চলে ইন্দো-ইসলামীয় ধারায় স্থাপত্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ছবি ৭.৮ :
কুতুব মিনার এবং আলাই দরওয়াজা, দিল্লি।

আলাই দরওয়াজার খিলান এবং গম্বুজ লক্ষ করো।

ছবি ৭.৯ :
সুলতান ইলতুৎমিশের
সমাধি, কুতুব-চত্বর, দিল্লি

স্থাপত্যশিল্পের বিরাট বদল হয় মুঘল শাসনের সময়ে। মুঘল সম্রাটরা প্রায় সবাই স্থাপত্যশিল্পের সমঝদার ছিলেন। নানান স্থাপত্যরীতির সহজ মেলামেশার ছাপ মুঘল স্থাপত্যে দেখা যায়।

সম্রাট বাবরের ছিল বাগানের খুব শখ। চারভাগে ভাগ করা একরকম সাজানো বাগান মুঘল আমলে বানানো হতো। তাকে 'চাহার বাগ' বলে। হুমায়ুনের আমলে দীন পনাহ শহরটি বানানো শুরু হয়। আফগান শাসক শের শাহ সাসারাম এবং দিল্লিতে কয়েকটি সৌধ বানিয়ে ছিলেন। সাসারামে তাঁর নিজের জন্য বানানো সমাধি সৌধটি যেন তাজমহলের পূর্বসূরি।

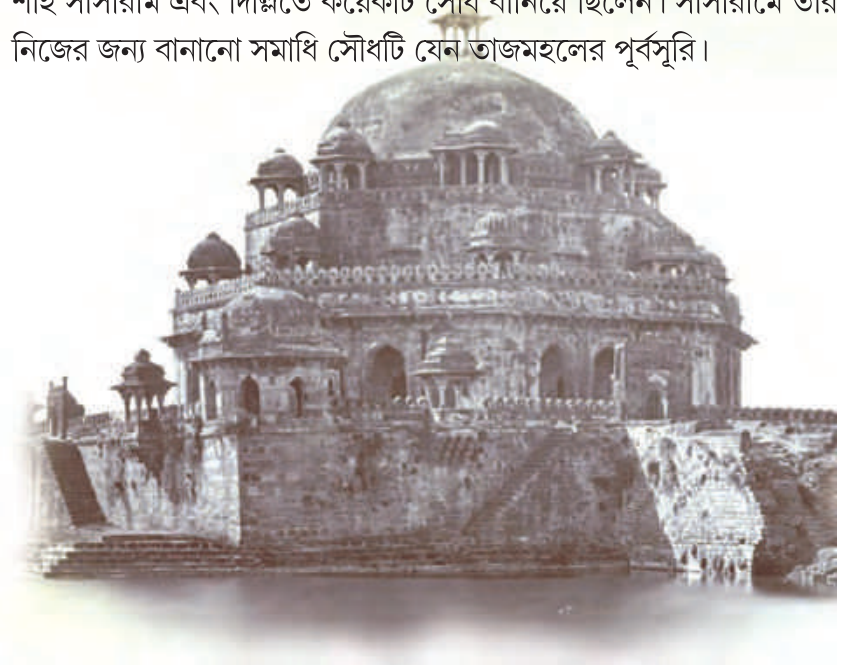

ছবি ৭.১০ :
শেরশাহর সমাধি সৌধ,
সাসারাম, বিহার

মুঘল স্থাপত্যশিল্পের প্রসার শুরু হয় সম্রাট আকবরের সময় থেকে। ভারতে মুঘল শাসনের প্রসার এবং স্থাপত্য বানানোর কাজ আকবর একসঙ্গে করেছিলেন। দুর্গ-শহর, প্রাসাদ বানানোয় আকবর মনোযোগী ছিলেন। এতে একদিকে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয়েছিল, অন্যদিকে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। আগ্রা দুর্গ এর অন্যতম উদাহরণ। আজমির, লাহোর, কাশ্মীর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে দুর্গ (গড়) গুলিও আকবরের সময়ে তৈরি করা হয়। গুজরাট জয়ের স্মৃতিতে আকবর বানিয়েছিলেন বুলন্দ দরওয়াজা।

ফতেহপুর সিকরি এবং তার প্রাসাদ, মসজিদ, মহল, দরবার আকবরের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা। *ফতেহ্* মানে জয়। জয়ী সম্রাট হিসাবে আকবর ধ্বংস করেননি। বরং উদার মন আর সৌন্দর্যবোধ নিয়ে তৈরী করেছেন ফতেহপুর সিকরি। ভারতের নানা প্রদেশের স্থাপত্যরীতি মিশে গেছে সিকরিতে। আকবর যে সমস্ত ভারতের সম্রাট, কোনো বিশেষ ধর্ম, জাতি বা অঞ্চলের শাসক নন– তারই নমুনা ফতেহপুর সিকরি।

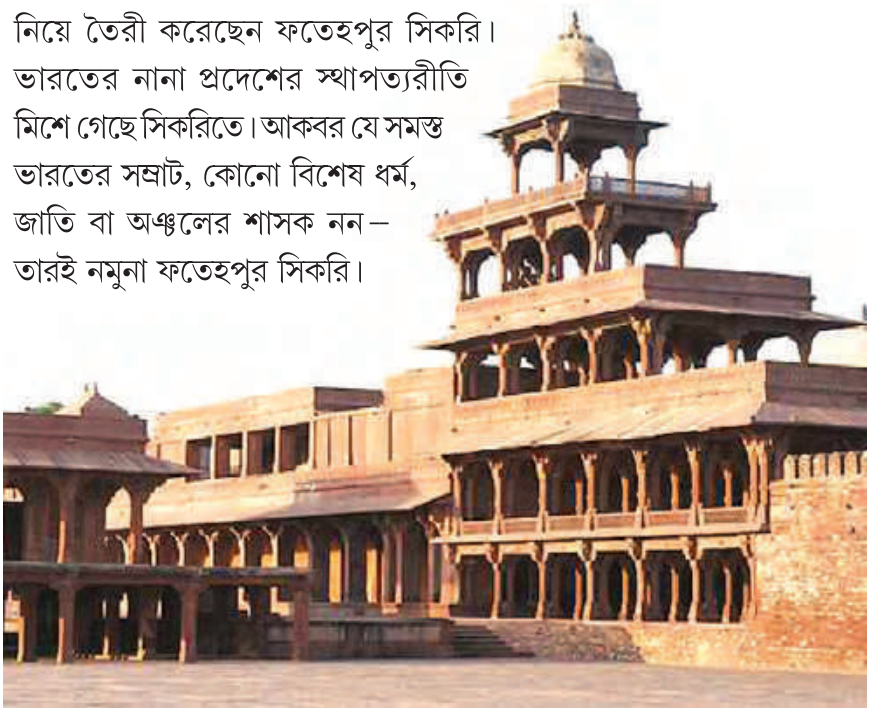

ছবি ৭.১১:
ফতেহপুর সিকরির পঞ্চমহল বা বাদগির

জাহাঙ্গিরের সময়ে বাগান বানানোর উদ্যোগ আবার শুরু হয়। আগ্রায়, কাশ্মীরে বানানো বাগানগুলির কথা সম্রাট জাহাঙ্গির লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী *তুজুক-ই জাহাঙ্গিরি* বইতে। এই সময়ে শ্বেতপাথরে রত্ন বসিয়ে একরকম কারুকার্য করার চল দেখা যায়। তাকে *পিয়েত্রা দুরা* বলে। জাহাঙ্গিরের সময়ে বানানো ইতিমাদ-উদ্ দৌলার সমাধি সৌধে পিয়েত্রা দুরা কারুকার্যের ব্যবহার দেখা যায়।

ছবি ৭.১২:
একটি মুঘলরীতির চাহার বাগ

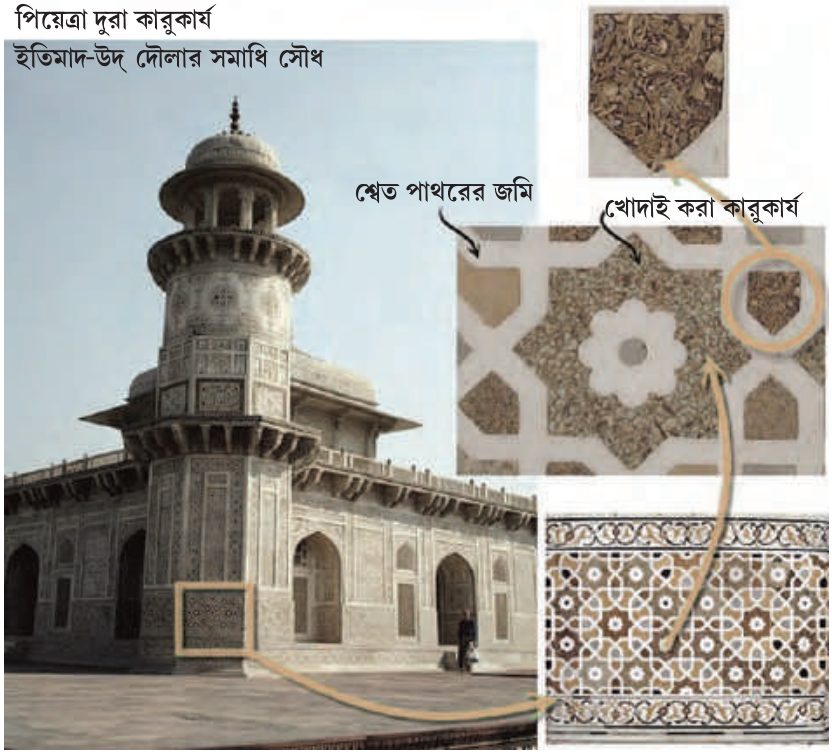

ছবি ৭.১৩:
ইতিমাদ-উদ্ দৌলা-র
সমাধি সৌধ, আগ্রা।

মুঘল স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তাজমহল। সম্রাট শাহ জাহানের সময়ে বানানো এই স্মৃতিসৌধটি এক আশ্চর্য স্থাপত্য। পাথরের ব্যবহার, কারুকার্য, শিল্পরীতির দিক থেকে তাজমহলের তুলনা নেই। তার পাশাপাশি লালকেল্লা, জামি মসজিদ এবং আগ্রা দুর্গের ভিতরে মোতি মসজিদ প্রভৃতি শাহজাহানের সময়ে স্থাপত্যশিল্পে উন্নয়নের সাক্ষী।

ছবি ৭.১৪ :
তাজমহল, আগ্রা

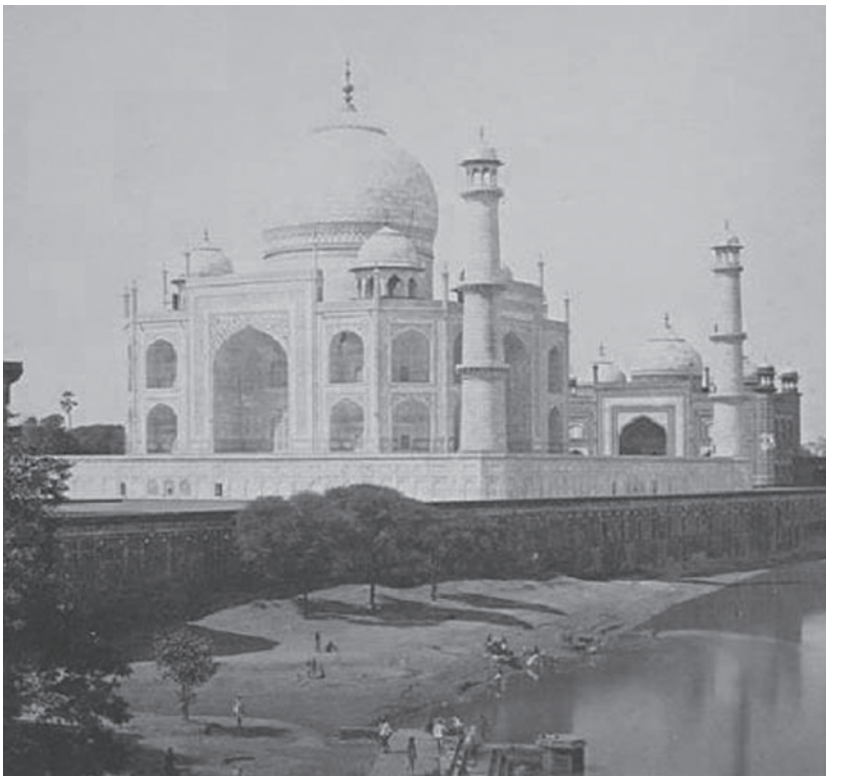

ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্যের মধ্যে নানান বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেইসব সামলাতে জেরবার বাদশাহ স্থাপত্য বানানোর দিকে মন দিতে পারেননি। তা ছাড়া যুদ্ধের জন্য খরচ অনেক বেড়ে যায়। তাই স্থাপত্যের জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করাও সম্ভব ছিল না। তবে, ঔরঙ্গজেবের সময়ে লালকেল্লার ভিতরে একটি মসজিদ বানানো হয়। দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গাবাদে তাঁর বেগমের স্মৃতিতে নির্মিত বিবি-কা মকবারা ঐ সময়ের বিখ্যাত স্থাপত্যশিল্প।

মুঘল স্থাপত্যরীতির প্রভাব গোটা দেশ জুড়েই লক্ষ করা যায়। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের অনেক আঞ্চলিক স্থাপত্যশিল্পেও সেই ছাপ স্পষ্ট।

দিল্লির সুলতান ও মুঘল বাদশাহদের সময়ের তৈরি স্থাপত্যগুলির একটি তালিকা তৈরি করো।

ছবি ৭.১৫:
মোতি মসজিদ, লালকেল্লা, দিল্লি। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য এই মসজিদটি বানানো হয়েছিল।

আঞ্চলিক স্থাপত্য

সুলতানি এবং মুঘল যুগে ভারতের নানা অঞ্চলে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। আঞ্চলিক শিল্পগুলির মধ্যে গুজরাট, বাংলা এবং দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যশিল্প বিখ্যাত।

গুজরাটের স্থাপত্যগুলি সাংস্কৃতিক মিলমিশের নিদর্শন। এতে ইসলামীয়, হিন্দু এবং জৈন নির্মাণশৈলীর স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আহমেদাবাদের জামি মসজিদ।

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যের প্রধান দিক হলো একাধিক দুর্গ ও দুর্গ-শহর। গুলবর্গা দুর্গ (১৩১৮ খ্রিঃ) এর অন্যতম উদাহরণ। বিদরের দুর্গ ও প্রাসাদগুলিতে ইরানি ধাঁচের দেয়ালচিত্র দেখা যায়। যদিও এদের অধিকাংশই এখন ভেঙে গেছে। তবে পালিশ করা চুনের দেয়ালে সোনালি, লাল ও নীল রং-এর অপূর্ব সব খোদাই কাজ এখনও বর্তমান। আহমেদনগরের চাঁদ বিবির প্রাসাদ একটি টিলার উপর আটকোণা ভিত্তির উপর নির্মিত। বিজাপুরে মহম্মদ আদিল শাহ (১৬২৭-'৫৬ খ্রিঃ) নির্মিত গোল গুম্বদ একটি সুন্দর স্থাপত্যকার্য। এর গম্বুজটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো গম্বুজ। কুতুবশাহি আমলের হায়দরাবাদের চারমিনার (১৫৯১খ্রিঃ) আঞ্চলিক স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন।

ছবি ৭.১৬ :
চারমিনার, হায়দ্রাবাদ

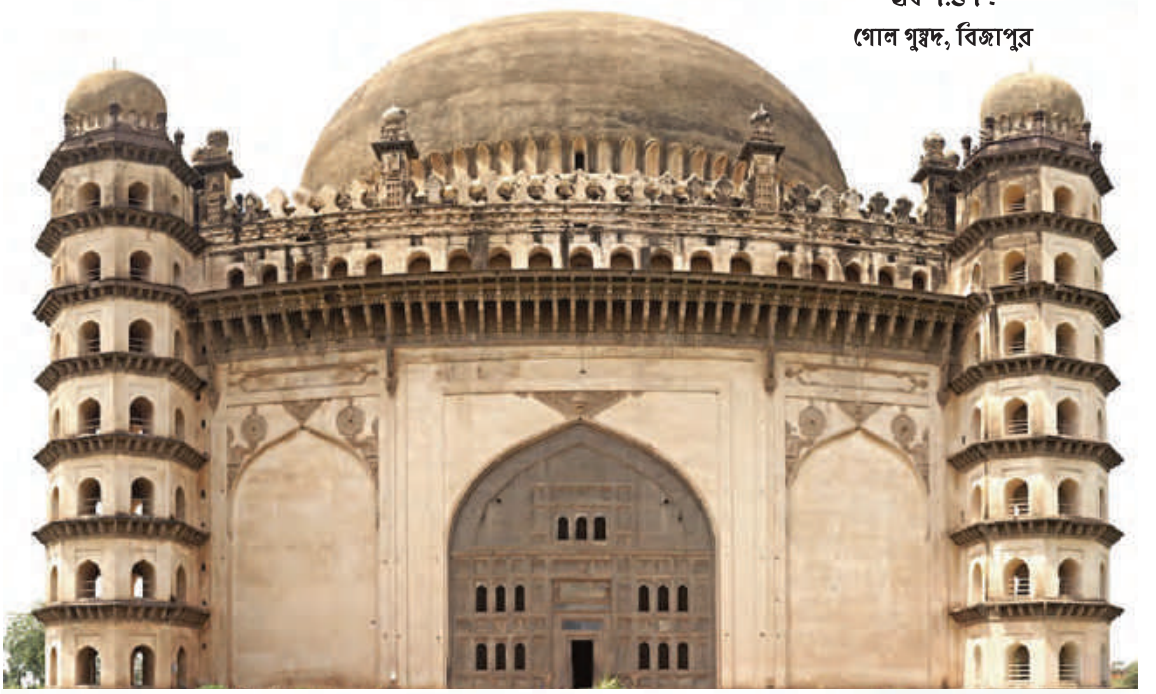

ছবি ৭.১৭ :
গোল গুম্বদ, বিজাপুর

ছবি ৭.১৮ :
বিঠল মন্দিরের পাথরের রথ,
হাম্পি, বিজয়নগর

বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পি সমেত বহু জায়গাতেই মন্দির এবং ইমারতগুলিতে দেখা যায় হিন্দু এবং ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির মেলামেশা। কল্পনাশক্তি, কারুকার্য ও শৈলীর দিক দিয়ে এগুলি অতুলনীয়।

বাংলার স্থাপত্যরীতি

মুসলমান শাসন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। এই সময়ে বাংলায় কাঠামো নির্মাণের মূল গঠনভঙ্গি ছিল ইসলামি রীতি অনুসারে। আর বাইরের কারুকার্য ও কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলার লৌকিকরীতির ছাপ দেখা যায়।

ইমারতে ইটের ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যরীতির একটি বৈশিষ্ট্য। বাড়ি এবং বেশির ভাগ মন্দির ঢালু ধাঁচে তৈরি করা হতো। এর পিছনে যুক্তি ছিল বেশি বৃষ্টিতে জল দাঁড়াতে পারবে না। এই বিশেষ নির্মাণ পদ্ধতির নাম *বাংলা*। অঞ্চলের নামেই স্থাপত্যরীতির নাম হওয়ার এটা একটা উদাহরণ। পুরোনো অনেক মন্দিরের কাঠামো এই ধাঁচেই তৈরি হতো। এমনই দুটি কাঠামো পাশাপাশি জুড়ে দিলে তাকে *জোড়-বাংলা* বলা হতো।

ছবি ৭.১৯ :
জোড়-বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর
(১৬৫৫খ্রিঃ)

তোমাদের অঞ্চলে কোনো পুরানো স্থাপত্য আছে? থাকলে বন্ধুরা মিলে সেখানে যাও। সেটা কবে তৈরি, কেমনভাবে তৈরি সেসব বিষয়ে ভালো করে জানো। সেসব খাতায় লিখে রাখো ও স্থাপত্যটির একটি ছবি আঁকো।

চাল বা চালাভিত্তিক মন্দির বানানোর রীতিও বাংলায় দেখা যায়। মন্দিরের মাথায় ক-টি চালা আছে, সে হিসাবেই কোনও মন্দির একচালা, কখনো দো-চালা, কখনো বা আট-চালা হতো। ইসলামীয় স্থাপত্যের ধাঁচে চালা গুলির মাথায়ও মাঝে মধ্যেই খিলান, গম্বুজ বানানো হতো।

সাধারণ আয়তক্ষেত্রাকার কাঠামোর উপর একাধিক চূড়া দিয়ে তৈরি মন্দিরও এই সময় বাংলায় বানানো হয়। সেই গুলির নাম *রত্ন*। একটি চূড়া থাকলে সেটি একরত্ন মন্দির, পাঁচটি চূড়া থাকলে পঞ্চরত্ন মন্দির।

এই মন্দিরগুলির বেশির ভাগের দেয়ালে পোড়ামাটির বা *টেরাকোটার* কাজ করা হতো। পোড়ামাটির তৈরি এই মন্দিরগুলি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ছাড়াও বাংলার নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

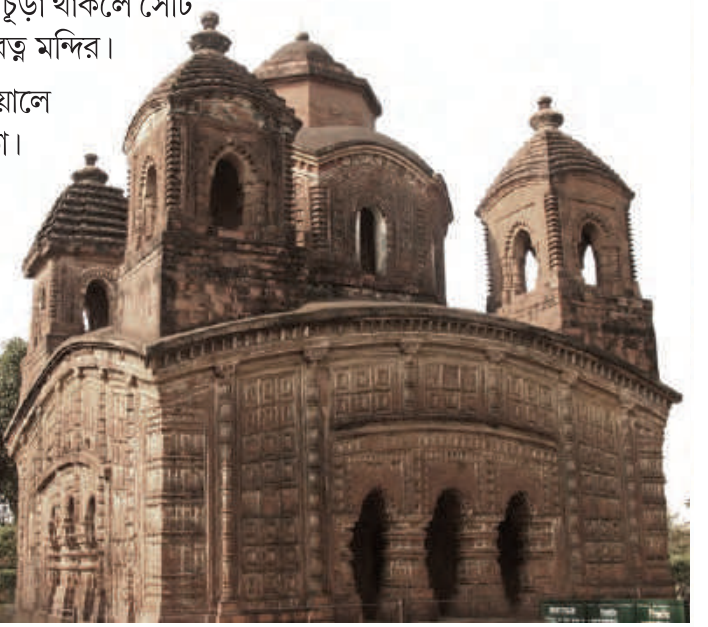

ছবি ৭.২০ : পঞ্চরত্ন মন্দির, বিষ্ণুপুর (১৬৪৩খ্রিঃ)

এই যুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসকে তিনটি মূল পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে (১২০১-১৩৩৯ খ্রিঃ) বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। ত্রিবেণীতে জাফর খানের সমাধির ভগ্নাবশেষ, এবং বসিরহাট-এ ছড়িয়ে থাকা কিছু স্তূপ ছাড়া এসময়কার কোনও স্থাপত্যই আজ আর নেই।

দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৩৩৯-১৪৪২ খ্রিঃ) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য হলো মালদহের পাণ্ডুয়ায় সিকান্দর শাহের বানানো আদিনা মসজিদ। এ ছাড়া, হুগলি জেলায় ছোটো-পাণ্ডুয়ার মিনার ও মসজিদ এবং গৌড়ের শেখ আকি সিরাজের সমাধি এই পর্যায়ের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য।

ছবি ৭.২১ : ফিরোজ মিনার, গৌড়

তৃতীয় পর্যায়ে (১৪৪২-১৫৩৯ খ্রিঃ) বাংলায় ইন্দো-ইসলামি রীতির স্থাপত্য শিল্প সবচেয়ে উন্নত হয়। পাণ্ডুয়ায় সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহর (যদু) সমাধি (একলাখি সমাধি নামে বিখ্যাত) এই ধাঁচের সেরা নিদর্শন। উচ্চতায় খুব বেশি না হলেও, টেরাকোটার গম্বুজ ও তার অর্ধগোল আকৃতির জন্য এটি বাংলায় ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যের উন্নতির অন্যতম নজির। বরবক শাহের আমলে তৈরি গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা এসময়ের আরও একটি উল্লেখযোগ্য নির্মাণ। এছাড়াও সে সময়ের রাজধানী গৌড়ের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যের নজির হলো তাঁতিপাড়া মসজিদ, গুম্মত মসজিদ ও লোটান মসজিদ। ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় ২৬ মিটার উচ্চতার ফিরোজ মিনার। ইঁট ও টেরাকোটার কাজ ছাড়া, এই মিনারটি সাদা ও নীল রং-এর চকচকে টালি দিয়েও অলংকৃত। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তৈরি বড়ো সোনা মসজিদ গৌড়ের সবচেয়ে বড়ো মসজিদ।

৭.৬ সুলতানি ও মুঘল যুগের শিল্পকলা

দরবারি চিত্রকলা

সুলতানি শাসন শুরু হওয়ার আগেও ভারতে ছবি আঁকার রেওয়াজ ছিল। মন্দির ও গুহার দেয়ালচিত্র তার সাক্ষী হয়ে আছে। তবে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে সুলতানি ও পরে মুঘল যুগে মৌলিক পরিবর্তন হয়। আস্তে আস্তে নানা চিত্ররীতির মিলমিশ লক্ষ করা যায় চিত্রকলায়। বিভিন্ন অঞ্চলেও নানারকম আঞ্চলিক চিত্ররীতি তৈরি হতে দেখা যায়।

সুলতানি যুগে বই এবং পাণ্ডুলিপিতে ছবি আঁকার চল দেখা যায়। সুন্দর হাতের লেখা, রঙিন ছবি সব মিলিয়ে বইগুলি সুদৃশ্য হয়ে উঠত। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলিতে এই প্রথার ছাপ পড়েছিল। *কল্পসূত্র*, *কালচক্রকথা*, *চৌরপঞ্চাশিকা* প্রভৃতি বইগুলিতে এধরণের লেখা ও ছবির ব্যবহার দেখা যায়। পারসিক মহাকাব্য *শাহনামা*-র ভারতীয় সংস্করণেও এধরনের রঙিন ছবি রয়েছে। তবে এই ছবিগুলির বিশেষ নিদর্শন দেখা যায় না।

এই চিত্রশিল্পীরা প্রধানত পশ্চিম ভারতের (গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল) বাসিন্দা ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরে মুঘল সম্রাট আকবরের কারখানায় যোগ দেন। সুলতানি চিত্রশিল্পের ধারা মুঘল যুগে আরও পরিণত ও উন্নত হয়ে ওঠে।

বইতে ছবি আঁকার বা অলংকরণের প্রথা সম্রাট বাবরের সময়েও দেখা যায়। এ ব্যাপারে হুমায়ুনের খুবই উৎসাহ ছিল। ইরান ও আফগানিস্তানে থাকার সময়ে তিনি আবদুস সমাদ ও মির সঈদ আলির কাজ দেখেন। মুগ্ধ হুমায়ুন পরে দিল্লিতে ফিরে তাঁদের নিয়ে মুঘল কারখানা খোলেন। সেই কারখানায় বইগুলি অপূর্ব সুন্দর হাতের লেখা ও অলংকরণ দিয়ে সাজানো হতো। *হমজানামা* বই-এর অলংকরণের কাজ হুমায়ুনের সময়েই শুরু হয়। সেই কাজ শেষ হয় আকবরের আমলে। এমন আরো উদাহরণ ছড়িয়ে আছে *রজমনামা*, *নল-দময়ন্তী*, *জাফরনামা* ইত্যাদিতে।

সুন্দর হাতের লেখার শিল্প সেকালে খুব চর্চা হতো। একে ইংরাজিতে বলে Calligraphy (ক্যালিগ্রাফি)। বাংলায় হস্তলিপিবিদ্যা বা হস্তলিপিশিল্প বলা যেতে পারে। ছাপাখানার রেওয়াজ ছিল না তখন। হাতে লেখা বইগুলিই ছিল শিল্পের নমুনা।

ছবি ৭.২২:
মুঘল কারখানায় বই অলংকরণের কাজ করছেন শিল্পীরা।

সম্রাট আকবরের সময়ে বইয়ের অলংকরণ শিল্পের আরও নমুনা পাওয়া যায়। *তুতিনামা*, *রজমনামা* (মহাভারতের ফারসি অনুবাদ) প্রভৃতি বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা সাজানো হতো সূক্ষ্ম হস্তলিপি এবং ছবি দিয়ে। আকার এবং আয়তনে ছোটো এই ছবিগুলিকে বলা হয় মিনিয়েচার (Miniature)। মিনিয়েচার কথাটা ইংরাজি, তবে সেটাই বেশি প্রচলিত। বাংলায় তাকে অণুচিত্র বলা যেতে পারে। সোনার রং এবং অন্যান্য রঙের ব্যবহার হতো বইতে। তাতে জ্বলজ্বল করত পৃষ্ঠাগুলি। লেখার চারপাশে নানারকম অলংকরণ করা হতো।

বই অলংকরণের পাশাপাশি প্রতিকৃতি আঁকাও আকবরের সময় থেকে শুরু হয়। জাহাঙ্গিরের আমলে প্রতিকৃতি আঁকার উন্নতি হয়। সে সময়ে থেকেই ইউরোপীয় ছবি আঁকার রীতি-নীতির ছাপ মুঘল চিত্রশিল্পে পড়েছিল। ছবিতে বাস্তবতা ও প্রকৃতিবাদ এর ছাপ স্পষ্ট হতে থাকে। ভারতের প্রকৃতি, উদ্ভিদ ও প্রাণী ছবির বিষয়বস্তু হিসাবে উঠে আসে।

ছবি ৭.২৩ :

বাদশাহ জাহাঙ্গিরের হাতে পৃথিবীর ভার (সার্বভৌম ক্ষমতা) তুলে দিচ্ছেন বাদশাহ আকবর। উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা পাওয়ার প্রতীক এই কাল্পনিক ছবিটি।

জাহাঙ্গিরের আমলেই শিল্পীরা প্রথম ছবিতে স্বাক্ষর (সই) করতে শুরু করেন। তাতে বোঝা যেত কোন ছবি কার আঁকা।

বাদশাহি বা অভিজাত নারীরা অনেকেই ছবি আঁকার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। তবে বাইরের শিল্পীদের দিয়ে অন্দরমহলের মহিলাদের ছবি আঁকানোর বিশেষ প্রচলন ছিল না। নাদিরা বানু, সাহিফা বানুর মতো মুঘল-নারীরা নিজেরাও ছবি আঁকতেন।

স্থাপত্যের পাশাপাশি শাহ জাহানের চিত্রশিল্পেও উৎসাহ ছিল। ছবির মধ্যে কাছে-দূরে বোঝানোর পদ্ধতির ব্যবহার এই সময়ে শুরু হয়। *পাদশাহনামা* গ্রন্থের অলংকরণ এই সময়ের বিখ্যাত কাজ। এইসব ছবিগুলি শিল্প হিসাবে অসাধারণ। অন্যদিকে সমকালীন ইতিহাসেরও উপাদান হয়ে উঠেছে ছবিগুলি।

শাহজাহানের পরে মুঘল চিত্রশিল্পের উন্নতি বড়ো একটা দেখা যায় না। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে দরবারি শিল্পীদের কাজ ব্যাহত হয়। তাদের অনেকেই মুঘল দরবার ছেড়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকদের দরবারে চলে যান। বাদশাহ, অভিজাতরাই বিষয়বস্তু হিসাবে মুঘল দরবারি ছবিগুলিতে বেশি ছাপ রেখেছিল। তবে তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ, তাদের কাজকর্মও ছবির মধ্যে ফুটে উঠেছিল।

টুকরো কথা

মুঘল চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আবুল ফজলের বিবরণ

"মনে করা হয় যে, সাদা এবং কালো সব রঙের উৎস। এ-দুটিকে দেখা হয় পরস্পর বিরোধী রং হিসেবে এবং অন্যান্য রঙের অংশরূপে। তার ফলে যখন অনেকটা পরিমাণে সাদা মেশানো হয় কিছুটা ভেজাল কালোর সঙ্গে, উৎপন্ন হয় হলুদ রং। সাদা ও কালো সমান পরিমাণে মেশালে আসে লাল। যখন অনেকটা বেশি পরিমাণে কালো রঙের সঙ্গে মেশানো হয় সাদা, পাওয়া যায় নীলচে সবুজ। এদেরকে মিশিয়েই অন্যান্য রঙও পাওয়া সম্ভব ..." — আবুল ফজল আল্লামি, *আইন-ই আকবরি*, আইন ৩৪ ('রঙের চরিত্র প্রসঙ্গে')।

কোনো কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য মিলিয়ে ছবি আঁকাকে বলে *তসভির*। বাদশাহ আকবর তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই এই ধরনের ছবি আঁকার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী ছিলেন। তাঁর আমলে বহু চিত্রকরপরিচিতি পায়। প্রতি সপ্তাহে দারোগা ও কেরানিরা সমস্ত চিত্রকরদের ছবি বাদশাহের সামনে পরিবেশন করত। তিনি তখন ছবির শৈল্পিক গুণের বিচার করে পুরস্কার ঘোষণা করতেন বা বাড়িয়ে দিতেন তাদের মাস মাইনে।

ছবি ৭.২৪:
চিত্রনন্দ ও উদীয় নামের দুটি যুদ্ধের হাতি লড়াই করছে।
***আকবরনামা*–র একটি মুঘল মিনিয়েচার।**

মুঘল শিল্পীদের ছবিতে যেন প্রাণহীন বস্তুও প্রাণ পায়। একশোর বেশি চিত্রকররা হয়ে উঠেছিলেন ছবি আঁকায় অতুলনীয়।

এই শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পারস্যের তাবরিজের **মির সঈদ আলি**, সিরাজের **খোয়াজা আবদুস সামাদ** যাঁর ছদ্মনাম ছিল 'শিরিন কলম' অর্থাৎ মিষ্টি কলম, **দসবন্ত** এবং **বসওয়ান**। দসবন্ত ছিল এক পালকি বাহকের ছেলে। তাঁর সমস্ত জীবন নিবেদিত ছিল এই শিল্পে। আঁকতে সে এতই ভালোবাসত যে দেয়ালেও এঁকে ফেলত মানুষের ছবি। স্বয়ং বাদশাহের সুনজরে পড়েন দসবন্ত। কালক্রমে আঁকার দক্ষতায় বাকি সব শিল্পীদের সে ছাড়িয়ে যায়। অকালে তার মৃত্যু হলেও দসবন্তের ছবিগুলো তাঁর প্রতিভার সাক্ষী। ছবির পটভূমিকা বা নানান অবয়ব আঁকতে, রঙের ব্যবহারে, প্রতিকৃতি আঁকাতে বা অন্যান্য বহু শাখায় বসওয়ানের দক্ষতা ছিল অসাধারণ।

আঞ্চলিক চিত্রকলা

মুঘলদের দরবারি চিত্রশিল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন আঞ্চলিক ছবি আঁকার রীতি দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ (১৫৮৬-১৬২৭খ্রিঃ) চিত্রশিল্পের সমঝদার ছিলেন।

রাজস্থান এবং পাহাড়ি অঞ্চলে (জম্মু, কাশ্মীর, কাংড়া প্রভৃতি) নানান ছবি আঁকার রীতি দেখা যায়। মুঘল রীতি ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এই আঞ্চলিক চিত্ররীতিগুলিতে মিলেমিশে গেছে। ছবির বিষয়, রঙের ব্যবহারের দিক থেকে এদের আলাদা মর্যাদা।

পৌরাণিক নানা দৃশ্য এবং বিষয় এই ছবিগুলির মূলকেন্দ্র ছিল। বিষয়বস্তু হিসাবে রাধা-কৃষ্ণের খুব ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর পাশাপাশি প্রতিকৃতি আঁকার চর্চাও জনপ্রিয় ছিল। রাজপুত রাজারা ছাড়াও জমিদাররাও নিজেদের এবং তাঁদের সভার ছবি আঁকাতেন। তবে এই প্রতিকৃতিগুলির পটভূমি অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা ছিল।

টুকরো কথা

'জগতের বিস্ময়'

বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ-র সময়ে সেরা চিত্রশিল্পী ছিলেন ফারুক হোসেন। তিনি প্রথমে মুঘল সম্রাট আকবরের কারখানায় যোগ দেন। ১৫৯০ থেকে ১৬০৫খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফারুখ হোসেন হঠাৎ মুঘল কারখানা থেকে উধাও হয়ে যান। মনে করা হয়, এই সময়েই তিনি ইব্রাহিমের জন্যে ছবি আঁকতেন। পরে হোসেন আবার মুঘল কারখানায় ফিরে যান। জাহাঙ্গির তাঁকে নাদির আল-অস্‌র (জগতের বিস্ময়) উপাধি দেন।

ছবি ৭.২৫: আলোচনারত রাধা–কৃষ্ণ, কাংড়া চিত্র।

সংগীত ও নৃত্য

সুলতানি এবং মুঘল আমলে সংগীত এবং নৃত্য শিল্পের চর্চাও হতো। ভারতবর্ষের সংগীত চর্চা আর ইরানি সংগীতচর্চার ধারা মিলেমিশে গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই সুফি পিররা *সমা* গানকে তাঁদের সাধনার অংশ করে তোলেন। পাশাপাশি ভক্তিধর্মের হাত ধরেও নানান আঞ্চলিক সংগীতচর্চা গড়ে ওঠে। কবীর, নানক, মীরাবাঈ সকলেই গানকে তাঁদের ঈশ্বর সাধনার অংশ করে নিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে কীর্তনের মাধ্যমেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার হতো।

সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা জারি ছিল। সেই সময়ের দুটি বই থেকে এবিষয়ে জানা যায়। আঞ্চলিক রাজ্যগুলিও সংগীতচর্চার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। সংগীত বিষয়ে লেখা বই অনেক সময়ে রাজা, সুলতানদের উৎসর্গ করা হতো। জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ শরকিকে *সংগীত শিরোমণি* (১৪২০ খ্রিস্টাব্দ) রচনাটি উৎসর্গ করা হয়। হোসেন শাহ শরকি নিজে সংগীত রাগ তৈরি করেছিলেন। তাকে হোসেনি বা জৌনপুরি রাগ বলে।

গোয়ালিয়রের রাজা মান সিং তোমর (১৪৫০-১৫২৮খ্রিঃ) ছিলেন সংগীতের সমঝদার। তাঁর সময়ে শাস্ত্রীয় ধ্রুপদগুলি সংস্কৃত থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়। *মান-কৌতূহল* সেই সময়ের একটি বিখ্যাত সংগীত গবেষণা গ্রন্থ। বৈজু বাওরা এই আমলের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী।

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সেরা সংগীতপ্রেমী ছিলেন আকবর। তাঁর দরবারের গুণীজনদের মধ্যে সংগীতজ্ঞরাও ছিলেন। আবুল ফজলের লেখায় ছত্রিশজন সংগীতশিল্পীর নাম পাওয়া যায়। তানসেন (১৫৫৫-১৬১০খ্রিঃ) ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। তাঁর সৃষ্টি দীপক, মেঘমল্লার প্রভৃতি রাগ। শোনা যায় যে, তাঁর সংগীত সাধনা এমনই ছিল যে, তাতে নিজে থেকে প্রদীপ জ্বলে উঠত, কখনওবা অকালে বর্ষা নামত।

শাহজাহানের সময়েও মুঘল দরবারে সংগীতের প্রচলন ছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বের প্রথম দশ বছর সংগীতশিল্পে উৎসাহী ছিলেন। তারপর সরকারি ভাবে সংগীতের পৃষ্টপোষণা বন্ধ হয়ে যায়।

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পরেও সংগীতের ঐতিহ্য বজায় ছিল। বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসক সংগীতের সমঝদার ছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সেই ঐতিহ্য আজও চলেছে।

টুকরো কথা

আমির খসরু

সুলতানি আমলে আমির খসরু হিন্দুস্তানি এবং ইরানি সংগীতের মিলন ঘটান খসরু। দিল্লির সুলতান থেকে সুফি পির--- খসরুর জনপ্রিয়তা ছিল সবাইয়ের কাছে। আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য জয়ের পরে কর্ণাটকী সংগীত শিল্পীরা দিল্লিতে এলে তাদের কাছেই আমির খসরু ভারতের প্রাচীন সংগীতচর্চার ব্যাকরণ শেখেন। শাস্ত্রীয় সংগীত বিষয়ে খসরুর অনেক লেখাও আছে। খেয়াল, তরানা, কওয়ালি প্রভৃতি সংগীতরীতি আমির খসরুর সৃষ্টি। মনে করা হয় সেতার, তবলা, পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রগুলিও তাঁর বানানো। এ ছাড়া আমির খসরু অনেক গজল এবং গীতিকাব্য লিখেছিলেন।

নৃত্যশিল্প : মণিপুরী নৃত্য

ভারতবর্ষে ধ্রুপদী নাচ মূলত ছ-টি : ভরতনাট্যম, কথাকলি, ওড়িশি, কুচিপুড়ি, কত্থক এবং মণিপুরী। তারমধ্যে নবীনতম মণিপুরী নৃত্যশৈলীর কথা আমরা জানব। অষ্টাদশ শতকে ভক্তির প্রবল প্রভাব পড়ে মণিপুরী সংস্কৃতিতে। তার ফলে তাদের আদি নৃত্য ধারার সঙ্গে যুক্ত হয় ভক্তিরস। সৃষ্টি হয় সংকীর্তন এবং রাসলীলা। বৈষ্ণব পদাবলির ভিত্তিতে রাধা-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রাসলীলাগুলি তৈরি করা হয়।

ছবি ৭.২৬:
মণিপুরী নৃত্যের একটি ভঙ্গিমার আঁকা ছবি।

মণিপুরের মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের হাতেই মণিপুরী রাসলীলার ধারাগুলির বিকশিত হয়। নাচের জন্য কুমিল পোশাকও তিনি তৈরি করেন। সংকীর্তনে পুঙ্গ নামের ঢোল বাজিয়ে মূলত ছেলেরাই নাচে।

৭.৭ ভাষা ও সাহিত্য

৭.৭.১ আরবি ও ফারসি

ইসলামের জন্ম আরব দেশে। তাই তার প্রচলন আরবি ভাষার মাধ্যমেই। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে কিন্তু আরবি ভাষার প্রচলন ছিল সীমিত। আরবির কদর ছিল কেবল ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে। বেশ কিছু সরকারি বই আরবি ভাষায় লেখা হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে লেখা *ফতাওয়া-ই আলমগিরি*। এটি তখনকার আইন ব্যবস্থার একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল। এটিকে কেউ কেউ ভারতে মুসলিম শাসনে লেখা শ্রেষ্ঠ মুসলমানি আইনের বই বলে থাকেন।

মধ্যযুগের ভারতে বরং আমরা দেখি ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল জনপ্রিয়তা। ভারতে ফারসি সাহিত্যের শুরু সুলতানি শাসনের হাত ধরে।

দশম শতাব্দীতে তুর্কিরা যখন ভারতে আসে তখন থেকেই বোধ হয় ফারসির প্রচলন ঘটে। এর আগে থেকেই অবশ্য ফারসি প্রশাসনিক ভাষা হিসাবে মধ্য এশিয়া এবং ইরানে প্রচলিত ছিল। সেখানে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই ভাষা বহুভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর থেকে ভাবা হয়তো ভুল নয় যে তুর্কিরা ফারসি ভাষার শক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিল। হয়তো সেই কারণেই ভারতে এই ভাষাকে গুরুত্ব দেয় তুর্কিরা। কুতবউদ্দিন আইবক ও ইলতুৎমিশ ফারসি ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে খলজি যুগের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়েই লাহোর শহর হয়ে ওঠে ফারসি ভাষাচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

সেসময় ফারসি সাহিত্যিক এবং দার্শনিকদের মধ্যে আমির খসরুর লেখা ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। ১২৫২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের বদাউনের কাছে পাটিয়ালিতে জন্ম খসরুর। তিনি চিরকাল তাঁর ভারতীয়ত্বের গর্ব করতেন। খসরুর এরকম ভারত-প্রীতি থেকে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যায়। তা হলো, কীভাবে ধীরে ধীরে তুর্কি শাসকরা তথাকথিত আক্রমণকারীর ভূমিকা বদলে এ দেশে পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়ার মানসিকতায় পৌঁছে গিয়েছিল। খসরু অনেক কবিতা ও কাব্য লেখেন। সারাজীবন ফারসি কাব্য লেখার নানান পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যান তিনি। খসরু ফারসি সাহিত্যের এক নতুন রচনাশৈলী *সবক-ই হিন্দ* -এর আবিষ্কারক।

এ সময়ে ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রেও ফারসি হয়ে ওঠে অতি পছন্দের ভাষা। এই ভাষার বিখ্যাত ঐতিহাসিকরা ছিলেন মিনহাজ- ই সিরাজ, ইসামি এবং জিয়াউদ্দিন বারনি। মধ্যযুগে বহু রচনা মূল সংস্কৃত থেকে ফারসিতে অনুবাদ করা হয়। এই ধারার প্রথম লেখক ছিলেন জিয়া নকশাবি। তিনি সংস্কৃত ভাষায় লেখা গল্পমালা ফারসিতে অনুবাদ করেন। তার নাম দেন *তুতিনামা*। এ ছাড়াও সে সময়কার কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল আবেদিনের উৎসাহে কলহন-এর *রাজতরঙ্গিনী* এবং *মহাভারত* ফারসিতে অনুবাদ করা হয়।

ফারসিতে অনুবাদের এই রেওয়াজ সমানভাবে চলতে থাকে তুঘলক, সৈয়দ ও লোদি আমলেও। মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে তার রাজধানী কিছু সময়ের জন্য দেবগিরি বা দৌলতাবাদে চলে যায়। তার ফলে দক্ষিণ ভারতে ফারসি চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের বাহমনি সুলতানেরাও ছিলেন ফারসি ভাষা চর্চায় খুব আগ্রহী। সেই কারণে বাহমনি-রাজধানী গুলবর্গা এবং বিদর হয়ে উঠেছিল ফারসি ভাষা এবং সাহিত্যের এক নামি কেন্দ্র।

মনে রেখো

কুতুবউদ্দিন আইবকের সময়ের একজন ঐতিহাসিক ছিলেন হাসান নিজামি। তাঁর লেখা ইতিহাসের নাম তাজ-উল মাসির। সেই বইতে নিজামি লিখেছেন— 'সব যুদ্ধ জয়ের পরেই চলতি প্রথা ছিল বিরোধীদের দুর্গ ও অন্যান্য ঘাঁটি গুলি বিশাল হাতিদের পায়ে পিষে গুঁড়ো করে দেওয়া।'

শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর সব দেশেই জয়ীরা পরাজিতদের সব শক্তি শেষ করার জন্য এসব করত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খ্রিস্টান সব ধর্মের শাসকরাই একাজ করেছেন। এটা আসলে রাজনৈতিক শক্তি দেখানোর একটা চেষ্টা।

ফারসির কার্যকারিতা এবং জনপ্রিয়তা আরো বেড়েছিল মুঘল আমলে। সম্রাট বাবর ছিলেন তুর্কি এবং ফারসি দুই ভাষাতেই সুপণ্ডিত। তাঁর আত্মজীবনী *তুজুক-ই বাবরি* বা *বাবরনামা* লেখা হয়েছিল তুর্কি ভাষাতে। এই বইটি ফারসিতেও অনূদিত হয়েছিল। হুমায়ুনও ছিলেন ফারসিপ্রেমী। গুলবদন বেগমের লেখা *হুমায়ুননামা* ফারসি ভাষায় লেখা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ইরান থেকে যখন ভারতে ফেরেন সম্রাট হুমায়ুন, তাঁর সঙ্গে আসেন বহু কবি-সাহিত্যিক। যেমন কাসিম খান মৌজি। ইনি ছিলেন হুমায়ুন এবং আকবরের সভাকবি। খ্রিস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে পারস্য থেকে বহু কবি এবং সাহিত্যিক এসে মুঘলদের দরবারে ভিড় জমান। পারস্যের সফাবি সাম্রাজ্য তখন পতনের মুখে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ওখানকার গুণী মানুষজন চলে আসে ভারতে। পারস্য এবং ভারতের এক সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঘটেছিল ফারসি ভাষার মধ্য দিয়ে। এতে বিশেষ লাভ হয় ভারতীয় সাহিত্যের। এক বিশিষ্ট কাব্যরীতির জন্ম হয় ফৈজি, উরফি, নাজিরি, বেদিলের মতো কবিদের লেখায়।

সম্রাট আকবরের আমলে ফারসি ভাষা এবং সাহিত্য ক্রমশ উন্নত হতে থাকে। তাঁর সময়ের রচনাগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হলো ইতিহাস লেখা। দ্বিতীয়টি অনুবাদ সাহিত্য। তৃতীয়টি ছিল কবিতা। ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে ছিল আবুল ফজলের *আকবরনামা* এবং *আইন-ই আকবরি*, বদাউনির *মুন্তাখাব-উৎ তওয়ারিখ* এবং নিজামউদ্দিন আহমেদের *তবকাত-ই আকবরি* ইত্যাদি।

আকবরের মতো সম্রাট জাহাঙ্গিরও ফারসির অনুরাগী ছিলেন। তাঁর শাসনকালে ভারতের নামি কবি ছিলেন তালিব আমুলি। শাহ জাহানের সময়েও এই চর্চা সমানভাবে চলতে থাকে। এর প্রমাণ আবদুল হামিদ লাহোরির মতো বিখ্যাত ঐতিহাসিকের লেখা। ফারসিতে অনুবাদের এই ধারা একেবারে কমে আসে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে। মনে করা হয় যে, তিনি পারস্যদেশ থেকে আসা কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি তেমন সদয় ছিলেন না। তবে ঔরঙ্গজেবের কন্যা জৈবউননিসা আরবি এবং ফারসি ভাষা ভালোবাসতেন ও তাতে কবিতাও লিখতেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব নিজেও এই ভাষা ভালোমতোই জানতেন। তার প্রমাণ ফারসিতে লেখা তাঁর কিছু চিঠিপত্র।

উপরের আলোচনা থেকে তোমরা যদি ভাবো যে, ফারসি ভাষা শুধু মুসলমান সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল— তবে তা ভুল হবে। অন্যরাও এই ভাষায় সমান পটু ও আগ্রহী ছিল। এর প্রমাণ রয়ে গেছে ঈশ্বরদাস নাগর, চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ বা ভীমসেন বুরহানপুরির মতো হিন্দু লেখকদের রচনা।

টুকরো কথা

আকবরের আমলে অনুবাদ

অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আকবরের নিজের উৎসাহে কয়েকজন লেখক মহাভারতের নানান অংশ ফারসিতে অনুবাদ করে। রজমনামা নামে সেটি বিখ্যাত। বদাউনি করেছিলেন রামায়ণের অনুবাদ। হাজি ইব্রাহিম সিন্ধি ফারসি ভাষায় বেদের অনুবাদ করেন। গ্রিক ভাষায় লেখা বেশ কিছু বইও ফারসিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। রাজা টোডরমল ভাগবৎপুরাণ অনুবাদ করেন ফারসিতে।

৭.৭.২ বাংলা সাহিত্য

সুলতানি আমলের গোড়ার দিকে কেমন ছিল বাংলা ভাষা তার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে সেই সময়কার কিছু পুঁথি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। এর ভাষা থেকে সুলতানি আমলের বাংলা ভাষা সম্পর্কে একটি ধারণা করা যেতে পারে।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে ইলিয়াসশাহি শাসন শুরু হলো বাংলায়। সেই সময় থেকে বাংলা ভাষায় লেখালেখির উদাহরণ পাওয়া যায়। ঐ ধারা বাকি সুলতানি এবং মুঘল আমলে বজায় ছিল।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক পর্যন্ত কেমন ছিল বাংলা ভাষা এবং সাহিত্য? আজকের মতো তখনও বাংলা ভাষা ছিল নানা রকম। তখনকার সাহিত্যে দেবদেবীর মহিমা প্রচারের ছাপ ছিল; কিছু কিছু গীতিকায় সাধারণ মানুষের জীবনের ছবিও ধরা থাকত।

যা লেখা হতো, তার বেশিরভাগই সুর করে গাওয়া হতো। তাই এই সময়ের অনেক লেখালেখিকে *পাঁচালি* বলা হয়। রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ বা দেবদেবীর পাঁচালি সবই গাওয়ার রেওয়াজ ছিল।

ভক্তিধর্মের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে খুব গভীর। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর বৈষ্ণব-ভক্তিবাদ নিয়ে অনেক সাহিত্য লেখা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে কাব্য লেখার চল ছিল। তার পাশাপাশি ছিল রাধা-কৃষ্ণকে নিয়ে পদ-কবিতা লেখার ধারা। তাকেই বলে পদাবলি সাহিত্য।

রামায়ণ, মহাভারত সেই সময়েও খুব জনপ্রিয় ছিল। ঐ দুই মহাকাব্যের নানা দিক নিয়ে অনেকেই এই সময়ে কাব্য লিখেছিলেন। তাছাড়া রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ তো ছিলই। *রামায়ণ* অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। কাশীরাম দাস *মহাভারত*-এর অনুবাদ করেছিলেন। ভাগবত-এর খানিক অংশ সে যুগের সরল বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল। সেই অনুবাদটির নাম *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*। অনুবাদটি করেন মালাধর বসু।

বাংলা সাহিত্যের আরেকটি পুরোনো এবং প্রধান ধারা ছিল *মঙ্গলকাব্য*। চণ্ডী, মনসা, ধর্ম এইসব দেব-দেবীর পুজোর চলনতো ছিলই। সেই পুজোর সময়ে ঐ দেব-দেবীর মহিমা শোনানো হতো গান গেয়ে। সেই গানগুলোর ভিতরে একটা গল্প থাকত। সেই গল্পগুলোকে ধরে বেশ কিছু সাহিত্য লেখা হয়। সেগুলোকেই মঙ্গলকাব্য বলে। 'মঙ্গল' মানে 'ভালো'। যে দেবতা বা দেবীর নামে মঙ্গলকাব্য লেখা হতো, তার পুজো করলে ভালো হবে—সেটাই

টুকরো কথা

মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদ

রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবত সবগুলোই আসলে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কিন্তু, যখনই কবিরা সেগুলি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন, তখনই তার ভিতরে এসেছে বেশ কিছু পরিবর্তন। সেই সময়কার বাংলার ছবি ফুটে উঠেছে ঐ অনুবাদ গুলিতে। বাল্মীকির লেখা রামায়ণের রাম আর কৃত্তিবাসের রামের চরিত্র অনেক আলাদা।

ছবি ৭.২৭ :
মনসামঙ্গল কাব্যের একটি ছবি। ছবিটিতে বেহুলা মৃত লখিন্দরকে নিয়ে ভেলায় ভেসে যাচ্ছে।

বলার চেষ্টা ছিল। চণ্ডীদেবীকে নিয়ে লেখা হয়েছিল *চণ্ডীমঙ্গল*। দেবী মনসাকে ঘিরে লেখা হয়েছিল *মনসামঙ্গল*। ধর্মঠাকুর ছিলেন *ধর্মমঙ্গল*-এর কেন্দ্রে। অনেক কবিই মঙ্গলকাব্য লিখেছেন। তবে সবগুলিতেই গল্পের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ দেবী বা দেবতার পুজো করার কথা বলা হয়েছে।

চণ্ডী, মনসা, ধর্ম প্রভৃতি দেবী-দেবতা সমাজের নীচু তলার মানুষের পুজো পেতেন। তাই এদের নিয়ে লেখা মঙ্গলকাব্যগুলিতে গরিব, সাধারণ মানুষের জীবনের ছবিও পাওয়া যায়। শিবকে নিয়েও এই সময়ে সাহিত্য লেখা হয়েছে। সেই লেখাগুলিকে *শিবায়ন* বলে। পুরাণে শিব বিষয়ে যে কাহিনি তার সঙ্গে শিব-দুর্গার ঘর-সংসারের কথা জুড়ে শিবায়ন কাব্যগুলি লেখা হয়েছে। গরিব শিব-দুর্গা এবং তাদের জীবনের কথা এসেছে ঐ লেখাগুলিতে। শিব সেখানে চাষবাস করে রোজগারের চেষ্টা করে। এই লেখাগুলিতে সেই সময়ের বাংলার গরিব কৃষক পরিবার যেন শিব-দুর্গার পরিবার হয়ে গেছে।

নাথ-যোগী নামের এক ধর্ম সম্প্রদায় এই সময়ে বাংলায় ছিল। তাদের দেবতা শিব। এই নাথ-যোগীদের ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণ নিয়েও এই সময়ে সাহিত্য লেখা হয়। তাকে বলে *নাথ সাহিত্য*। এই লেখাগুলিতে সন্ন্যাস-জীবন যাপনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের জীবন এবং কাজ নিয়ে লেখালেখির ধারা এই সময়ে শুরু হয়। চৈতন্যের জীবনী নিয়ে কাব্য লেখেন অনেক বৈষ্ণব কবি। এগুলিকে *চৈতন্যজীবনীকাব্য* বলা হয়।

আরবি-ফারসির সঙ্গে বাংলা ভাষার মিলমিশ ঘটিয়ে এই সময়ে লেখালেখির ধারা ছিল। সৈয়দ আলাওল এবং দৌলত কাজি সেই ধারার কবি। আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যে সুলতান আলাউদ্দিন খলজির চিতোর রাজ্য অভিযানের কথা আছে।

মনে রেখো

নাথ-সাহিত্যের একটা বিখ্যাত অংশ হলো ময়নামতীর কথা ও গোপীচন্দ্রর গান। শুধু বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কথা ও গানটি প্রচলিত। এই গল্পটি বাংলা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল বিহার, পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে।

ভেবে বলোতো, কিভাবে সেই যুগে এই গল্পটি বাংলা থেকে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে পারে?

৭.৮ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এক সময়ে অনেকেই ভাবতেন যে প্রাচীনকালই ছিল বিজ্ঞানচর্চা এবং সাহিত্য-শিল্পসৃষ্টির 'সুবর্ণ যুগ'। তুলনায় মধ্যযুগ হলো ইতিহাসের এক 'অন্ধকার সময়'। তাদের মতে ঐ সময় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতির চাকা প্রায় থেমে যায়। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এখন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আর পাঁচটা সময়ের মতো মধ্যযুগেও ভারতবর্ষ এই সমস্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করেছিলো।

বিজ্ঞানে উন্নতির বহু তথ্য আমরা পাই অল বিরুনির *কিতাব-অল হিন্দ*-এ। ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই লেখার মধ্যে দিয়েই তামাম ইসলামি দুনিয়ায় তিনি ছড়িয়ে দেন বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতের চিন্তাধারা। ঠিক কেমন ছিল বিজ্ঞান নিয়ে তখনকার ভারতীয়দের ভাবনা?

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যাপক উন্নতি ঘটে মধ্যযুগে। এর আরম্ভ সুলতানি আমল থেকে। দিল্লিতে একটা উঁচু মিনারের উপর ফিরোজ শাহ তুঘলক তৈরি করান একটা মানমন্দির। তার উপর বসানো হয় একটা সূর্যঘড়ি। এছাড়া খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে চৈনিক চৌম্বক কম্পাস এর ব্যবহার শুরু হয় ভারতের সামুদ্রিক এলাকাগুলিতে।

মুঘল বাদশাহ আকবর ছিলেন বিজ্ঞান প্রসারের বিষয় খুবই আগ্রহী। তাঁর দরবারে অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলের উপর বিশেষ নজর দেওয়া হতো। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়—যেমন জিনিসের দাম, জনসংখ্যা, ফুল-ফল, আবহাওয়া, খাজনার হার ইত্যাদির হিসাবপত্র সুষ্ঠুভাবে রাখা হতো। এছাড়া আকবরের রাজসভার ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন যে, শিক্ষিত না হলেও আকবর নিজে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে আগ্রহ রাখতেন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজও করতেন। সম্রাট জাহাঙ্গির *তুজুক-ই জাহাঙ্গিরি*-তে উদ্ভিদবিদ্যা ও জীববিদ্যার বিষয়ে বেশ কিছু কথা লিখেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন জয়পুরের রাজা সওয়াই জয় সিংহ। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি দিল্লি, জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা এবং বারাণসীতে মানমন্দির তৈরি করেন।

মধ্যযুগের ভারতে সুলতানি শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই আমদানি হয় গ্রিকো-আরবি ধারার ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রের। উত্তর ভারত থেকে এই চিকিৎসাপদ্ধতি ক্রমশ অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসাও চালু ছিল সর্বত্র। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের মতো

কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটকের হাত ধরে ইউরোপীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিও ভারতে আসে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে।

সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই সময়ে বড়ো রকমের বদল হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে বারুদ-ব্যবহারকারী আগ্নেয়াস্ত্র চিন থেকে মোঙ্গলদের হাত ঘুরে প্রথমে ভারতে এসে পৌঁছয়। এর কিছু পরে ভারতের কিছু অঞ্চলে শুরু হয় বারুদচালিত রকেটের ব্যবহার। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চিন ও মামেলুক-শাসিত মিশর থেকে বন্দুকের প্রযুক্তি আসে ভারতে। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে পোর্তুগিজরা এই প্রযুক্তি দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে দেয়। এই সময়ের আশেপাশেই মুঘলরাও উত্তর ভারতে যুদ্ধে ব্যাপকহারে বন্দুক ও কামানের ব্যবহার চালু করে। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সময় ঘোড়ার দু-পাশে সৈনিকের পা রাখার জন্য পাদানির (রেকাব) ব্যবহার তুর্কি বাহিনীকে বাড়তি সুবিধা দিত। অশ্বারোহী, পদাতিক এবং রণহস্তীর সঙ্গে এ দেশের রাজা-বাদশাহদের সৈন্যবাহিনীতে ক্রমশ কামান-চালক এবং বন্দুকধারী সৈন্যরা জায়গা করে নিতে থাকে।

ছবি ৭.২৮ :
মুঘলদের রণথম্ভোর দুর্গ অভিযানের একটি ছবি। কামান পাহাড়ি পথে উপরে তোলার জন্য গবাদি পশুর ব্যবহার হতো।

ভারতীয়রা আদিকাল থেকে তালপাতায় কিংবা গাছের ছালে লিখত। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে চিনে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে কাগজ তৈরি করার প্রযুক্তি চিন থেকে প্রথম নিয়ে আসে মধ্য এশিয়ার মোঙ্গলরা। অল্প কিছু কালের মধ্যেই ভারতে কাগজের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে লেখাপড়ার কাজ সহজ হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে ভারতে কাগজ নাকি এতটাই সস্তা হয়ে ছিল যে, ময়রা মিষ্টি দেবার জন্য কাগজ ব্যবহার করতো। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতে প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাও করেন ইউরোপীয় মিশনারিরা। বাণিজ্যিকভাবে এই প্রযুক্তির প্রচলনের জন্য অবশ্য আরো বেশ কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়।

মধ্যযুগের ভারতে বয়নপ্রযুক্তিতেও (কাপড় বোনা) নানা রকম বদল হয়। খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসে পৌঁছয় তুলো বুনবার যন্ত্র 'চরখি'। এই সময় নাগাদই কাপড় বুনবার তাঁতেরও প্রচলন হয়। বিভিন্ন ছবিতে সন্ত কবীরকে তাঁত বুনতে দেখা যায়।

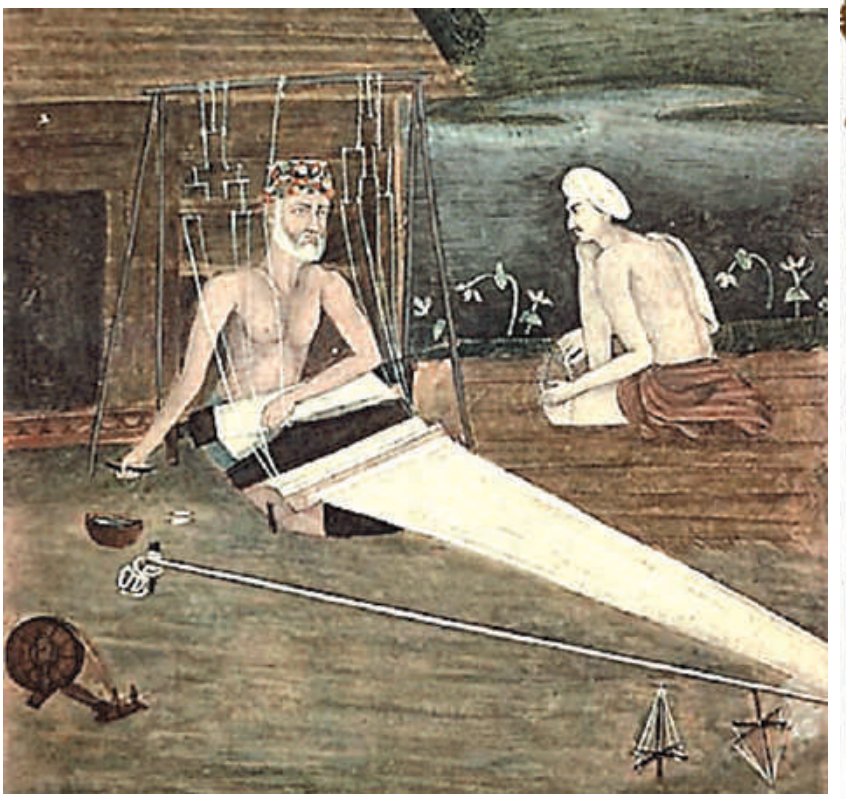

ছবি ৭.২৯:
সন্ত কবীর তাঁত বুনছেন।

এর কিছু পরে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে তুর্কিশাসকদের সঙ্গেই ভারতে আসে চরকা। ভারতে এই যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই ইসামির *ফুতুহ-উস সালাতিন* বইতে। তুলো থেকে সুতো বোনবার এই প্রযুক্তি দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগীয় ভারতে বস্ত্রশিল্প, বিশেষত কাপড় রং করার এবং ছাপার পদ্ধতি ছিল খুবই উন্নত। নানা ধরনের কাপড় তৈরি হতো ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে ভারতে 'ব্লক' ছাপাইয়ের আরম্ভ হয়। এই শিল্প ক্রমশ নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক নাগাদ ছিট (Chintz) ভারতে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে ছাপা কাপড় রপ্তানিও করা হতো।

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে ভারতে বিশেষত বাংলায়, রেশমশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। তুঁত গাছের গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরি করার প্রযুক্তি এদেশে আসে চিন থেকে। অনেকটা বারুদ ও কাগজের মতোই। এর পর আগামী দুশো বছর ধরে বাংলার মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং কাশিমবাজার অঞ্চল ছিল ভারতের গুটিপোকা চাষের প্রধান কেন্দ্র। এখান থেকে দেশে-বিদেশে রেশম রপ্তানি করা হতো।

খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে উত্তর ভারতে মুঘলদের হাতে বাগিচাশিল্পের (বাগান তৈরি) ব্যাপক প্রসার ঘটে। প্রাচীনকাল থেকেই যে কলমপ্রথা চলে আসছিল, এই সময়ে এসে তার খুবই উন্নতি লক্ষ করা যায়। পোর্তুগিজদের হাত ধরে এই বিষয়ে কিছু ইউরোপীয় প্রযুক্তিও এই সময়ে ভারতে আসে। এই সব ঘটনার ফলে ভারতের ফলমূলের গুণগত মান এই সময়ে কিছুটা উন্নত হয়েছিল।

ছবি ৭.৩০: চাহার বাগ তৈরির কাজ তদারক করছেন বাদশাহ বাবর।

টুকরো কথা

চাহার বাগ

মুঘলরা খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে ভারতে নিয়ে আসে নতুন এক বাগান বানানোর কৌশল। ফারসিতে এর নাম *চাহার বাগ* (হিন্দিতে চার বাগ)। একটি বাগানকে জল দিয়ে চারটি সমান আয়তনের বর্গে ভাগ করা হতো। তারপর গোটা বাগানে নানরকম ফুলফলের গাছ লাগিয়ে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করা হতো। পারস্যে ও মধ্য-এশিয়া থেকে এই বাগান-রীতি মুঘলরা ভারতে নিয়ে আসে। মুঘল বাদশাহদের মধ্যে বাগান করার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ রাখতেন বাবর, জাহাঙ্গির ও শাহজাহান। লাহোরের শালিমার বাগ, কাশ্মীরের নিসাত বাগ, দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধি ও আগ্রাতে তাজমহলে এই চাহার বাগের নিদর্শন পাওয়া যায়।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক নাগাদ পারস্যদেশ থেকে ভারতে আসে বেল্ট এবং গিয়ার-লাগানো সাকিয়া বা পারসিক চক্র (Persian Wheel)। ছোটো নাগরদোলার মতো দেখতে কাঠের তৈরি এই যন্ত্রের মাধ্যমে পশুশক্তির সাহায্যে কুয়ো বা খাল থেকে জল তোলা যেত। তবে যন্ত্রটি দামি হওয়ায় ভারতীয় কৃষকসমাজে এটি খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে এটি ব্যবহার হতো।

কৃষিক্ষেত্রে মধ্যযুগের সবথেকে বড়ো উন্নতির দিক ছিল সেচব্যবস্থার প্রসার। দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর শাসকরা এবং উত্তর ভারতে ফিরোজ শাহ তুঘলক এবং মুঘল বাদশাহরা সেচ ব্যবস্থার খুব উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ জমি পাথুরে এবং নদীর সংখ্যা তুলনায় কম হওয়ার ফলে সেচের কাজ করা ছিল কঠিন। এখানে বড়ো মাপের জলাধার খনন করে তার থেকে ছোটো নালা বা খালের মাধ্যমে চাষের জমিতে জল পৌঁছে দেওয়া হতো। অন্যদিকে উত্তর এবং পূর্ব ভারতে ছোটো বড়ো নদীর সংখ্যা অনেক। এই নদীগুলি থেকে খালের মাধ্যমে জল সরাসরি পৌঁছে যেত চাষের জমিতে।

ছবি ৭.৩১ : একটি আধুনিক গিয়ার-লাগানো সাকিয়া বা পারসিক চক্র।

মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি বিকাশের একটি বড়ো ক্ষেত্র ছিল ঘর-বাড়ি নির্মাণশিল্প। সুলতানদের বানানো শহরগুলিতে এর প্রমাণ আছে। বাঁকানো খিলান, গম্বুজ, চুনের ব্যবহার ইত্যাদি ছিল এর বৈশিষ্ট্য। মুঘল যুগেও এই ধারা বজায় ছিল। এই শিল্পে ভারতীয় কারিগর এবং তুর্কি স্থপতিরা মিলেমিশে ইন্দো-মুসলিম নির্মাণরীতির জন্ম দিয়েছিল।

মধ্যযুগের ভারতে অনেক নতুন প্রযুক্তিই এসেছিল চিন, পারস্য বা ইউরোপের মতো নানা অঞ্চল থেকে। ভারতীয় কারিগরেরা এইসব প্রযুক্তিকে আয়ত্তে আনে সহজেই। কখনওবা এগুলিতে সামান্য পরিবর্তন করে নিজেদের কাজের উপযোগী করে তোলে। তবে এই সময়ের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মৌলিক অবদান বিশেষ দেখা যায় না। খ্রিস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চায় জোয়ার আসে এবং তার ফলে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ক্রমশ বড়ো রকমের বদল দেখা যায়। তেমন কিছু আমরা ভারতবর্ষে বা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় লক্ষ করি না। এই প্রসঙ্গে ভুললে চলবে না যে, ভূগোল, ভৌতবিজ্ঞান, জীববিদ্যা এবং সামরিক প্রযুক্তিতে এই সময়ে ইউরোপে, বিশেষত পশ্চিম ইউরোপে, দারুণ অগ্রগতি হয়েছিল। মূলত তারই সুবাদে ইউরোপের পক্ষে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে গোটা পৃথিবীতে রাজত্ব স্থাপন করা সম্ভব হয়।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১. শূন্যস্থান পূরণ করো:

(ক) _____ (টালি এবং ইঁট/সিমেন্ট এবং বালি/শ্বেতপাথর) ব্যবহার করে বাংলায় সুলতানি এবং মুঘল আমলে সাধারণ লোকের বাড়ি বানানো হতো।

(খ) কবীরের দুই পংক্তির কবিতাগুলিকে বলা হয় _____ (ভজন/কথকথা/দোহা)।

(গ) সুফিরা গুরুকে মনে করত _____ (পির/মুরিদ/বে-শরা)।

(ঘ) _____ (কলকাতা/নবদ্বীপ/মুর্শিদাবাদ) ছিল চৈতন্য-আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র।

(ঙ) _____ (নানক/কবীর/মীরাবাঈ) ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বা গিরিধারীর সাধিকা।

(চ) দীন-ই ইলাহি-র বৈশিষ্ট্য ছিল মুঘল সম্রাট এবং তাঁর অভিজাতদের মধ্যে _____ (গুরু-শিষ্যের/মালিক-শ্রমিকের/রাজা-প্রজার) সম্পর্ক।

(ছ) শ্বেতপাথরে রত্ন বসিয়ে কারুকার্য করাকে বলে _____ (চাহার বাগ/পিয়েত্রা দুরা/টেরাকোটা)।

(জ) মহাভারতের ফারসি অনুবাদের নাম _____ (হমজানামা/তুতিনামা/রজমনামা)।

(ঝ) (দসবন্ত/মির সঈদ আলি/আবদুস সামাদ) _____ পরিচিত ছিলেন 'শিরিনকলম' নামে।

(ঞ) জৌনপুরি রাগ তৈরি করেন _____ (বৈজু বাওরা/হোসেন শাহ শরকি/ইব্রাহিম শাহ শরকি)।

(ট) শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের লেখকের নাম _____ (কাশীরাম দাস/কৃত্তিবাস ওঝা/মালাধর বসু)।

(ঠ) 'পারসিক চক্র' কাজে লাগানো হতো _____ (জল তোলার জন্য/কামানের গোলা ছোড়ার জন্য/বাগান বানানোর জন্য)।

২. নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়?

(ক) বিবৃতি : নদীর ধারে শিল্পগুলি তৈরি হতো।

ব্যাখ্যা-১ : নদীর ধারে শিল্প তৈরি করলে কর লাগতো না।

ব্যাখ্যা-২ : সেকালে সব মানুষই নদীর ধারে থাকতো।

ব্যাখ্যা-৩ : কাঁচা মাল আমদানি এবং তৈরি মাল রপ্তানির সুবিধা হতো।

(খ) বিবৃতি : চৈতন্য বাংলা ভাষাকেই ভক্তি প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা-১: তিনি শুধু বাংলা ভাষাই জানতেন।

ব্যাখ্যা-২: সে কালের বাংলার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা।

ব্যাখ্যা-৩: ভক্তি বিষয়ক সব বই বাংলায় লেখা হয়েছিল।

(গ) **বিবৃতি :** চিশতি সুফিরা রাজনীতিতে যোগ দিতেন না।

ব্যাখ্যা-১ : তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে ঈশ্বর-সাধনা সম্ভব নয়।

ব্যাখ্যা-২ : তাঁরা রাজনীতি বুঝতেন না।

ব্যাখ্যা-৩ : তাঁরা মানবদরদী ছিলেন।

(ঘ) **বিবৃতি:** আকবর দীন-ই ইলাহি প্রবর্তন করেন।

ব্যাখ্যা-১ : তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : তিনি অনুগত গোষ্ঠী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা-৩ : তিনি যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

(ঙ) **বিবৃতি :** মুঘল সম্রাটরা দুর্গ বানাতে আগ্রহী ছিলেন।

ব্যাখ্যা-১ : দুর্গ বানানোর খরচ ছিল কম।

ব্যাখ্যা-২ : দুর্গ বানানো ছিল প্রাসাদ বানানোর চেয়ে সহজ।

ব্যাখ্যা-৩ : দুর্গ বানানোয় সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হতো।

(চ) **বিবৃতি :** জাহাঙ্গিরের আমলে ইউরোপীয় ছবির প্রভাব মুঘল চিত্রশিল্পে পড়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : এই সময়ে ইউরোপীয় ছবি মুঘল দরবারে আসতে শুরু করেছিল।

ব্যাখ্যা-২ : মুঘল শিল্পীরা সবাই ছিলেন ইউরোপীয়।

ব্যাখ্যা-৩ : ভারতীয় শিল্পীরা এই সময় ইউরোপ থেকে ছবি আঁকা শিখে এসেছিলেন।

(ছ) **বিবৃতি :** মধ্য যুগের মণিপুরী নৃত্যে রাধা-কৃষ্ণ ছিলেন প্রধান চরিত্র।

ব্যাখ্যা-১ : ভারতে নৃত্যের দেব-দেবী হলেন কৃষ্ণ এবং রাধা।

ব্যাখ্যা-২ : এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরে বিস্তার লাভ করেছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : চৈতন্যদেব ছিলেন মণিপুরের লোক।

(জ) **বিবৃতি :** ভারতে প্রাচীন কালে তালপাতার উপরে লেখা হতো।

ব্যাখ্যা-১ : সে আমলে কাগজের ব্যবহার জানা ছিল না।

ব্যাখ্যা-২ : সে আমলে ভারতে কাগজের দাম খুব বেশি ছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : সে আমলে ভারতীয়রা কাগজের উপরে লেখার কালি আবিষ্কার করতে পারেনি।

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতে কোন কোন ফল, সবজি এবং শস্যের চাষ সবচেয়ে বেশি হতো?

(খ) মধ্য যুগের ভারতে ভক্তি সাধক-সাধিকা কারা ছিলেন?

(গ) সিলসিলা কাকে বলে? চিশতি সুফিদের জীবনযাপন কেমন ছিল?

(ঘ) দীন-ই ইলাহি-র শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান কেমন ছিল?

(ঙ) স্থাপত্য হিসাবে আলাই দরওয়াজার বৈশিষ্ট্য কী?

(চ) ক্যালিগ্রাফি এবং মিনিয়েচার বলতে কী বোঝায়?

(ছ) শিবায়ন কী? এর থেকে বাংলার কৃষকের জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

(জ) কাগজ কোথায় আবিষ্কার হয়েছিল? মধ্য যুগের ভারতে কাগজের ব্যবহার কেমন ছিল তা লেখো।

৪। **বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :**

(ক) মধ্য যুগের ভারতে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা লেখো।

(খ) কবীরের ভক্তি ভাবনায় কীভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এক হয়ে গিয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

(গ) বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলাফল কী হয়েছিল বিশ্লেষণ করো।

(ঘ) বাদশাহ আকবরের দীন-ই ইলাহি সম্বন্ধে একটি টীকা লেখো।

(ঙ) মুঘল সম্রাটদের আমলে বাগান তৈরি এবং দুর্গনির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা করো।

(চ) মধ্য যুগের বাংলার স্থাপত্যরীতির পর্যায়গুলির মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

(ছ) মুঘল চিত্রশিল্পের উন্নতিতে মুঘল বাদশাহদের কী ভূমিকা ছিল ?

(জ) মধ্য যুগের ভারতে কীভাবে ফারসি ভাষার ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা বেড়েছিল তা বিশ্লেষণ করো।

(ঝ) সুলতানি এবং মুঘল আমলে সামরিক এবং কৃষি প্রযুক্তিতে কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল বলে তোমার মনে হয়?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) রাজনীতি, জীবনযাপন এবং ধর্ম নিয়ে একজন সুহরাবর্দি সুফি সাধকের সঙ্গে কবীরের কাল্পনিক সংলাপ লেখো।

(খ) মনে করো তুমি চৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপের একজন সাধারণ মানুষ। তুমি দেখলে চৈতন্যদেব নগরসংকীর্তনে বেরিয়েছেন। তুমি কী করবে?

(গ) যদি তুমি মুঘল কারখানার একজন চিত্রশিল্পী হতে তা হলে বাদশাহের সুনজরে পড়ার জন্য তুমি কী কী ছবি আঁকতে?

(ঘ) ধরো তুমিই আজ তোমার শ্রেণির শিক্ষিকা/শিক্ষক। তুমি বাংলা ভাষায় আরবি এবং ফারসি শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে পড়াচ্ছ। রোজকার বাংলা কথাবার্তায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের একটি তালিকা তুমি ছাত্র-ছাত্রীদের দিতে চাও। এমন একটি তালিকা তুমি তৈরি করো। দরকারে একটি বাংলা অভিধানের সাহায্য নাও।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট

৮.১. গোড়ার কথা

মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট বুঝতে হলে কেন ঐ সংকট তৈরি হয়েছিল তা জানা দরকার। তার জন্য ঐ সময়ের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন লক্ষ করতে হবে। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্য অনেক বড়ো হয়ে পড়েছিল এবং মনসব নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে মারাঠাদের মতো এক আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। এরা মুঘলদের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে। শিখদের সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এতদিন ধরে মুঘলরা নিজেদের যে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই ধারণায় আঘাত করা হয়। এই অধ্যায়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে এই আঞ্চলিক শক্তিগুলির প্রতিরোধের কথাই আমরা পড়ব।

এই প্রতিরোধগুলির চরিত্র ছিল এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম। মারাঠারা নিজেদের স্বরাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল। জাঠ এবং সৎনামি বিদ্রোহ মুঘল আমলে কৃষিব্যবস্থার সংকটের দিকটি তুলে ধরেছিল। আঞ্চলিক স্বাধীনতা এরা সকলেই চেয়েছিল। তবে এই আন্দোলনগুলিকে ধর্মীয় প্রতিরোধ বলা কিন্তু ঠিক নয়।

৮.২ শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র

যুদ্ধপটু মারাঠাদের বাস ছিল পুণে এবং কোঙ্কণ অঞ্চলে। তারা অনেকেই বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডার রাজদরবারে উচ্চপদে ছিল। কিন্তু তাদের কোনো নিজস্ব রাজ্য ছিল না। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে শিবাজি মারাঠাদের জোটবদ্ধ করেছিলেন।

শিবাজির (জীবনকাল ১৬৩০-'৮০ খ্রিঃ) বাবা শাহজি ভোঁসলে বিজাপুরের সুলতানের জায়গিরদার ছিলেন। শিবাজি তাঁর মা জিজাবাঈ এবং শিক্ষক দাদাজি কোণ্ডদেবের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিজাপুরের সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে শিবাজি বিজাপুরের বেশ কিছু জমিদারকে নিজের দলে নিয়ে আসেন। সুলতান শিবাজিকে দমন করতে আফজল খানকে পাঠান। আফজল খান শিবাজিকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সতর্ক শিবাজি উল্টে বাঘনখ নামের একটি অস্ত্র দিয়ে আফজল খানকেই হত্যা করেন। শিবাজির ক্ষমতাবৃদ্ধি

ছবি ৮.১ : বাঘ নখ

ঔরঙ্গজেবের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। শিবাজি দু-বার বন্দরনগরী সুরাট আক্রমণ করে লুঠপাট করেন। ঔরঙ্গজেব শিবাজিকে দমন করতে শায়েস্তা খান, মুয়াজ্জম এবং মির্জা রাজা জয়সিংহকে পাঠান। জয়সিংহ ১৬৬৫খ্রিস্টাব্দে শিবাজিকে পুরন্ধরের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী শিবাজি মুঘলদের ২৩টি দুর্গ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মনে রেখো, সে যুগে দুর্গ ছিল নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান স্তম্ভ। এরপর শিবাজি আগ্রার মুঘল দরবারে পৌঁছলে তাকে অপমান করা হয়। তাঁকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করা হয়। শিবাজি একটি ফলের ঝুড়িতে লুকিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। দাক্ষিণাত্যে পৌঁছে মুঘলদের সঙ্গে আবার শিবাজির দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থান ছিল কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে একটি বড়োসড়ো প্রতিরোধ আন্দোলন। শিবাজি একটি সুপরিকল্পিত এবং স্বাধীন শাসনব্যবস্থার সূচনা করেন। রায়গড়ে তাঁর অভিষেক হয় (১৬৭৪ খ্রিঃ)। অর্থাৎ, অন্যান্য মারাঠা সর্দারদের থেকে তিনি যে আলাদা সেটাই প্রমাণিত হলো। তাঁর আটজন মন্ত্রীকে বলা হতো অষ্টপ্রধান। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পেশওয়া। মারাঠারা নিজেদের রাজ্যকে বলত স্বরাজ্য। স্বরাজ্যের বাইরে মারাঠা সেনারা আশপাশের মুঘল এলাকাগুলি আক্রমণ করে সেখান থেকে কর আদায় করত। যেসব সৈনিক মারাঠা রাজ্যে স্থায়ীভাবে চাকরি করত তাদের বলা হতো বর্গি। শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠাদের জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে।

টুকরো কথা

মাবলে ও পেশওয়া

শিবাজি এক সময় পুণের আশপাশের অঞ্চলগুলি আক্রমণ করছিলেন। তখন তিনি মাওয়াল অঞ্চল থেকে এক দল পদাতিক সেনা সংগ্রহ ও নিয়োগ করেন। এদের বলা হতো মাবলে বা মাওয়ালি। এরা তাঁর সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল।

শিবাজির মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে পেশওয়াদের হাতেই শাসন ক্ষমতা চলে আসে। তখন মুঘল শাসনের বড়োই দুর্দিন। শিবাজির মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে পেশওয়া প্রথম বাজীরাও হিন্দু রাজাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই হিন্দু রাজ্যের আদর্শকে বলা হয় হিন্দুপাদপাদশাহি। অর্থাৎ তিনি চাইলেন ধর্মের নামে মুঘলদের বিরুদ্ধে অন্য রাজাদের জোটবদ্ধ করতে।

মানচিত্র ৮.১ : খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত

মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

শিখ শক্তি ও মুঘল রাষ্ট্র

শিখদের সঙ্গে জাহাঙ্গির এবং শাহজাহানের আমলে মুঘলদের সংঘাত হয়। এই সংঘাতের চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। শিখরা তাদের গুরুর প্রতি অনুগত ছিল। তাই নিয়ে অনেক সময় মুঘল রাষ্ট্রের সঙ্গে শিখদের সংঘাত বেঁধে যেত। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকের শেষের দিকে চতুর্থ গুরু রামদাসের ছেলে অর্জুনদেব শিখদের গুরু হন। এই সময় থেকেই শুরু হলো বংশানুক্রমিকভাবে গুরু নির্বাচন করা। গুরু অর্জুনের ছেলে গুরু হরগোবিন্দ একসঙ্গে দুটি তলওয়ার নিতেন। তিনি বোঝাতে চাইতেন যে শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁর আছে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছ, শিখদের উত্থান অনেকটাই একটা স্বাধীন শক্তির উত্থানের মতোই হয়ে

উঠেছিল। মুঘল সরকারের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। নবম শিখ গুরু তেগবাহাদুর ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির বিরোধিতা করেন। কিন্তু শুধু ধর্মীয় কারণেই মুঘল-শিখ সংঘাত হয়নি। এ কথাও প্রচলিত যে তেগবাহাদুর এক পাঠানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাঞ্জাবে মুঘল শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন। তেগবাহাদুরকে বন্দী করে মুঘলরা হত্যা করে। এই ঘটনার পর শিখরা পাঞ্জাবের পাহাড়ি এলাকায় চলে যায় এবং সেখানেই দশম শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

টুকরো কথা

খালসা

১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে গুরু গোবিন্দ সিংহ খালসা নামক একটি সংগঠন তৈরি করেন। খালসার কাজ ছিল শিখদের নিরাপদে রাখা। সামরিক প্রশিক্ষণ শিখদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ ছিল। গুরু গোবিন্দ সিংহই শিখদের 'পন্থ' বা পথ ঠিক করে দেন। গুরু তাদের পাঁচটি জিনিস সবসময় কাছে রাখতে বলেন। এই পাঁচটি জিনিসের নামই 'ক' অক্ষর দিয়ে শুরু। এগুলি হলো—কেশ, কঙ্ঘা (চিরুনি), কচ্ছা, কৃপাণ এবং কড়া। এছাড়াও খালসাপন্থী শিখরা 'সিংহ' পদবি ব্যবহার করতে শুরু করল। পাহাড়ি হিন্দু রাজাদের সঙ্গে শিখদের মাঝে মধ্যেই ছোটোখাটো যুদ্ধ চলত। শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হিন্দু রাজারা মুঘল সরকারের সাহায্য চেয়েছিল। মুঘলদের পক্ষেও শিখ সামরিক শক্তির উত্থান মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিখদের সংঘাতের চরিত্র ছিল মূলত রাজনৈতিক। গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য বান্দা বাহাদুর লড়াই চালিয়ে যান।

গুরু গোবিন্দ সিংহ মুঘলদের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। শিখ ধর্মীয় আন্দোলন মানুষের মধ্যে সমতার কথা বলত। তবে অনেক সময় সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে এটি একটি প্রতিরোধী আন্দোলন হিসাবে রাজনৈতিক রূপ নিত।

অন্যান্য কয়েকটি বিদ্রোহ

দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলের জাঠরা ছিল প্রধানত কৃষক। তাদের মধ্যে অনেকে আবার জমিদারও ছিল। রাজস্ব দেওয়া নিয়ে জাহাঙ্গির ও শাহজাহানের আমলে তাদের সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত হতো। ঔরঙ্গজেবের আমলে তারা স্থানীয় এক জমিদারের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে। জাঠরা একটি পৃথক

রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিল। মুঘলদের বিরুদ্ধে জাঠ প্রতিরোধ ছিল একদিকে কৃষক বিদ্রোহ অন্যদিকে একটি আলাদা গোষ্ঠীপরিচয়ে জাঠরা একজোট হচ্ছিল। মথুরার কাছে নারনৌল অঞ্চলে এক দল কৃষক মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে। এরা ছিল সৎনামি নামে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঠান উপজাতিরা মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

এই সমস্ত বিদ্রোহগুলি আসলে মুঘল প্রশাসনের কেন্দ্রীয় স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন। তাছাড়া ঔরঙ্গজেবের সময় থেকে কৃষি সংকটও বেড়ে গিয়েছিল। সেটিও ছিল এই বিদ্রোহগুলির একটি কারণ।

৮.৩ জায়গিরদারি ও মনসবদারি সংকট : কারণ ও প্রভাব

শাহ জাহানের সময় থেকেই মনসবদারি ও জায়গিরদারি ব্যবস্থার সমস্যা দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই মনসবদারদের তাদের পদ অনুযায়ী যা বেতন পাওয়ার কথা, তা দেওয়া যেত না। অনেক সময় আবার কৃষক বিদ্রোহের কারণে রাজস্ব আদায় করা যেত না। এছাড়া দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করাও সবসময় সম্ভব হচ্ছিল না। মনসবদারেরা বেতন না পেলে তাদের যতজন ঘোড়সওয়ারের দেখাশোনা করার কথা, ততজনের দেখাশোনা করা যেত না। অর্থাৎ খাতায় কলমে হিসাবের সঙ্গে আসলে যা হচ্ছে, তার তফাত বেড়েই চলেছিল। ঔরঙ্গজেবের সময় এই সমস্যা আরও বেড়েছিল।

জায়গিরদারি এবং মনসবদারি সংকটের সঙ্গে যুক্ত সে যুগের কৃষি সংকট। এই সময় ফসলের উৎপাদন বেড়েছিল। কিন্তু কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের সময়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য মুঘল মনসবদাররা মারাঠা সর্দারদের সাহায্যও নিত। তার মানে ঐ সব অঞ্চলে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ আলগা হয়ে গিয়েছিল। এদিকে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে আবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে অভিজাতরা চাইলেন জমি থেকে তাদের আয় আরও বাড়াতে। তারা জমিদার এবং কৃষকদের উপর চাপ বাড়াতে থাকে। কৃষকরাও বিদ্রোহের পথ বেছে নেয়। অনেক সময় জমিদাররাও তাদের মদত দিত।

কোনো কোনো সময়ে কৃষকরা রাজস্ব না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেত। তখন তাদের জমিতে চাষ হতো না। চাষ না হলে রাজস্ব আদায় করা যাবে না। তাই যে সব মনসবদার এই সব জমিতে জায়গির পেত, তারাও ভালোভাবে ঘোড়সওয়ারের ভরণপোষণ করতে পারত না।

ঔরঙ্গজেব বিজাপুর এবং গোলকোণ্ডা জয়ের পর দাক্ষিণাত্যের বিশাল অঞ্চল মুঘলদের হাতে এসেছিল। ঐ অঞ্চলের সব থেকে ভাল জমিগুলি

ভেবে বলোতো কৃষি সংকট বলতে কী বোঝায়?

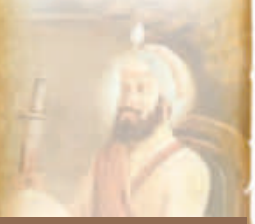

টুকরো কথা

মুঘল দরবারে দলাদলি

সপ্তদশ শতকের শেষে মনসবদারদের মধ্যে ভালো জায়গির পাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র ও লড়াই শুরু হলো। দরবারি রাজনীতিতে ইরানি, তুরানি, মারাঠা, রাজপুত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত শুরু হলো। মনসবদারি এবং জায়গিরদারি সংকটের জন্য কোনো একজন মুঘল শাসক দায়ী ছিলেন না। অনেকদিন ধরে নানা সমস্যা জট পাকিয়ে ওই সংকট তৈরি করেছিল।

ঔরঙ্গজেব খাস জমি বা খালিসা হিসাবে রেখেছিলেন। সেগুলি জায়গির হিসাবে দেওয়া হতো না। খাস জমির রাজস্ব সরাসরি কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হতো। সুতরাং, জমির অভাব ছিল না তবে জায়গির হিসাবে দেওয়া যায়, এরকম ভালো জমির পরিমাণ কমে গিয়েছিল। মুঘল শাসকেরা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বাড়াতে পারেননি। ফলে এই সমস্যা আরো গভীর হয়েছিল।

বলো তো ভালো জমিগুলি কেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব খাস জমি করে রেখেছিলেন?

টুকরো কথা

মুঘল সাম্রাজ্যের চরিত্র

মুঘল সাম্রাজ্য কতটা শক্তিশালী ছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক আছে। এক দল ঐতিহাসিক মনে করেন যে মুঘলরা ছিল দারুণ বলশালী। তাদের তৈরি করা সাম্রাজ্যের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের বীজ। আসমুদ্রহিমাচলে ছড়িয়ে ছিল মুঘলশক্তির ক্ষমতা। আরেক দল ঐতিহাসিক মনে করেন যে মোটেও মুঘলরা এতটা ক্ষমতা রাখত না। তাঁদের একজনের মতে মুঘল সাম্রাজ্যকে এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিশ্ছিদ্র গালিচার সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। বরং মোটামুটিভাবে জোড়াতালি দেওয়া একটা কম্বল হিসেবেই ভাবা ঠিক হবে। উত্তর ভারতে মুঘলদের আধিপত্য থাকলেও অন্যান্য অঞ্চলে তাদের ক্ষমতা ছিল সীমিত।

ছবি ৮.২ : মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খানের শিবিরে শিবাজির অতর্কিত হামলার দৃশ্য। জানালা দিয়ে পালানোর সময় শায়েস্তা খানের হাতের আঙুল শিবাজির তলওয়ারের কোপে কাটা যায়। ঘটনার স্থান পুণে, সময় ১৬৬৩ খ্রি:।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১. **নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও:**

(ক) পুণে, কোঙ্কণ, আগ্রা, বিজাপুর।

(খ) বান্দা বাহাদুর, আফজল খান, শায়েস্তা খান, মুয়াজ্জম।

(গ) অষ্ট প্রধান, বর্গি, মাবলে, খালসা।

(ঘ) রামদাস, তেগবাহাদুর, জয়সিংহ, হরগোবিন্দ।

(ঙ) কেশ, কৃপাণ, কলম, কঙ্ঘা।

২. **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:**

'ক' স্তম্ভ	*'খ' স্তম্ভ*
রায়গড়	নারনৌল
হিন্দুপাদপাদশহি	শিবাজি
গোলকোন্ডা	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত
সৎনামি	প্রথম বাজীরাও
পাঠান উপজাতি	দাক্ষিণাত্য

৩. **সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও:**

(ক) ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে কী কী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল?

(খ) কবে, কাদের মধ্যে পুরন্দরের সন্ধি হয়েছিল? এই সন্ধির ফল কী হয়েছিল?

(গ) জাঠদের সঙ্গে মুঘলদের সংঘাত কেন বেঁধেছিল?

(ঘ) শিবাজির সঙ্গে মুঘলদের দ্বন্দ্বের কারণ কী ছিল?

(ঙ) বিজাপুর ও গোলকোন্ডা জয়ের ফলে মুঘলদের কী সুবিধা হয়েছিল?

৪. **বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও:**

(ক) মুঘলদের বিরুদ্ধে শিখরা কীভাবে নিজেদের সংগঠিত করেছিল?

(খ) মুঘল যুগের শেষ দিকে কৃষি সংকট কেন বেড়ে গিয়েছিল? এই কৃষি সংকটের ফল কী হয়েছিল?

(গ) মুঘল যুগের শেষ দিকে জায়গিরদারি ও মনসবদারি ব্যবস্থায় কেন সংকট তৈরি হয়েছিল? মুঘল সাম্রাজ্যের উপর এই সংকটের কী প্রভাব পড়েছিল?

(ঘ) সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থা বিষয়ে তোমার মতামত কী?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) ধরো তুমি একজন মারাঠা সর্দার। তোমার সঙ্গে একজন জাঠ কৃষকের দেখা হয়েছে। মুঘল শাসনের নানা দিক নিয়ে ঐ জাঠ কৃষকের সঙ্গে তোমার একটি কথোপকথন লেখো।

(খ) ধরো তুমি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারের একজন ঐতিহাসিক। তুমি মারাঠা, শিখ, জাঠ ও সৎনামিদের লড়াইয়ের ইতিহাস লিখছো। কীভাবে তুমি তোমার লেখায় এই লড়াইগুলির ব্যাখ্যা করবে?

(গ) ধরো তুমি একজন অভিজাত জায়গিরদার। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে তোমার সঙ্গে তোমার জমির কৃষকদের সম্পর্ক নিয়ে একটি সংলাপ লেখো।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

নবম অধ্যায়

আজকের ভারত

সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন

এতক্ষণ যা যা পড়া হলো, সেসব ছিল পুরোনো দিনের কথা। কিন্তু, সেই পুরোনো অনেক কিছুর ছাপ এখনও আমাদের উপরে পড়ে। পুরানো দিনের অনেক শব্দ এখনও আমরা ব্যবহার করি। পুরোনো দিনের অনেক ধারণা এখনও আমাদের চারপাশে রয়েছে। শুধু সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে ধারণাগুলি আরও বদলেছে মাত্র। তবে তার ভেতরের মূলকথাটা অনেক ক্ষেত্রে একই রয়ে গেছে।

তেমনই একটা ধারণা 'সরকার'। সরকার শব্দটা ফারসি থেকে এসেছে। মধ্যযুগে ভারতে এই শব্দটির মানে শাসনকর্তা বা শাসনব্যবস্থা—দুই হতো। এই সরকার শব্দটা আজও আমরা ব্যবহার করি। ইংরেজিতে এর সমান শব্দ হলো Government (গভর্নমেন্ট)। Govern মানে শাসন করা।

আমরা যে দেশে এখন বাস করি, সেই ভারতেও একটা সরকার আছে। সব স্বাধীন দেশেই সরকার থাকে। আগে ক্ষমতার জোরে যুদ্ধে জিততেন যিনি, তিনিই শাসন করতেন। এখন দেশের লোকেরা নিজেরা ঠিক করেন কে বা কারা দেশশাসন করবে। নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে শাসক বেছে নেওয়ার এই পদ্ধতিকেই বলে 'গণতন্ত্র'। 'তন্ত্র' মানে ব্যবস্থা। লোকজন বা জনগণ নিজেরাই দেশের তন্ত্র বা ব্যবস্থা ঠিক করেন বলেই এটা গণতন্ত্র। এইভাবে জনগণ যাদের বেছে নেন দেশ চালাবার জন্য, তারা মিলেই হয় সরকার।

মনে রেখো

এর আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা রাজা, সুলতান, বাদশাহের কথা পড়েছি। তাদের শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। এখনও কোনো কোনো দেশে রাজা-রানি আছেন। যেমন ইংল্যান্ড, জাপান। তবে সেসব দেশেও গণতান্ত্রিক সরকার আছে। জনগণ সেখানে নিজেরাই সরকার বেছে নেন। ভারতে রাজা-রানি নেই। এখানে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী আছেন।

প্রত্যেক দেশ কীভাবে চলবে তার নিয়মকানুন আছে। এই নিয়মকানুনকেই 'সংবিধান' বলা হয়। 'বিধান' শব্দটার মানেই নিয়ম। বেশিরভাগ দেশেরই সংবিধান আছে লিখিত আকারে। আবার কোনো কোনো দেশে তা লেখা নেই। সেখানে বহু বছর ধরে চলে আসা নিয়মগুলোই মেনে নেওয়া হয়।

বলোতো অনেক আগে বাংলায় একবার প্রজারাই তাদের রাজাকে বেছে নিয়েছিলেন। কে সেই রাজা? এর উত্তর লুকিয়ে আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

ভারতের একটি লিখিত সংবিধান আছে। ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সংবিধান। এত ধারা-উপধারা আর কোনো দেশের সংবিধানে নেই। এই সংবিধানের প্রধান রূপকার ড. বি. আর. আম্বেদকর। ভারতীয় সংবিধানে দেশের সরকার বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে দেশের জনগণের অধিকারকেই স্বীকার করা আছে। সেই অধিকার মেনেই প্রতি পাঁচ বছর পরে পরে দেশে একবার নির্বাচন হয়। যাকে চলতি কথায় 'ভোট হওয়া' বলে। সেই নির্বাচনে ভোট দিয়ে দেশের মানুষ আগামী পাঁচ বছরের জন্য সরকার বেছে নেন।

ছবি ৯.১ :

ড. বি. আর. আম্বেদকর
জন্ম : ১৮৯১খ্রিঃ
মৃত্যু : ১৯৫৬খ্রিঃ

টুকরো কথা

ভারতের সংবিধান

প্রায় তিন বছর আলোচনা-বির্তকের পরে ভারতের সংবিধান তৈরি হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ঐ সংবিধান কার্যকর হয়। ২৬ জানুয়ারি 'প্রজাতন্ত্র দিবস' পালন করা হয়।

ভারত একটা বিশাল দেশ। এই দেশে একটাই কেন্দ্রীয় সরকার আছে। আবার প্রতিটা রাজ্যের নিজস্ব সরকার আছে। তাদের বলা হয় রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দুটোই জনগণ বেছে নেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্বাচন করেন দেশের সমস্ত জনগণ। রাজ্য সরকারকে নির্বাচন করেন ঐ রাজ্যের বাসিন্দারা।

সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার দুয়েরই কী কী ক্ষমতা, তা বলা আছে। যে শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দু-রকম সরকারের ক্ষমতাই স্বীকার করা হয়, তাকে বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা। ফলে, ভারতের সরকার একদিকে গণতান্ত্রিক— কারণ জনগণ নিজেরা শাসক বেছে নেন। আবার অন্যদিকে তা যুক্তরাষ্ট্রীয়— কারণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য দু-ধরনের সরকারই এই শাসনব্যবস্থায় আছে।

'সরকার' ধারণাটি তার কাজের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে, সরকারের কাজ কী— এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। খুব সাধারণভাবে বললে, সরকারের কাজ হলো দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। জনগণের যাতে ভালো হয় তার জন্য নানান উদ্যোগ নেওয়া, কর সংগ্রহ করা, দেশের স্বাধীনতা বজায়, রাখা। দেশের শান্তি ও উন্নতির জন্য সরকার কাজ করবে। আর এইসব কাজে সরকারকে পথ দেখাবে সংবিধান। সংবিধান মেনেই সরকার দেশ শাসন করবে।

সরকারের কাজকর্মকে চালানোর জন্য তিনটি বিভাগ করা হয়েছে। আইন বিভাগ,যেখানে দেশ পরিচালনার আইন তৈরি হবে। শাসন বিভাগ, ঐ আইন অনুসারে যারা দেশ পরিচালনা করবে। বিচার বিভাগ, সংবিধান অনুসারে দেশ

ছবি ৯.২ :
নতুন দিল্লিতে অবস্থিত ভারতের সংসদ ভবন।

শাসন হচ্ছে কিনা, জনগণের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে কিনা—এসবের প্রতি নজর রাখবে। আর কেউ নিয়ম ভাঙলে, তার ব্যবস্থা নেওয়াও বিচার বিভাগের কাজ।

টুকরো কথা

সরকারের বিভাগ

সব দেশেই বিচার বিভাগকে বাকি দুটি বিভাগের (আইন ও শাসন) থেকে আলাদা রাখা হয়। কোনোভাবেই যাতে সুবিচারের পথ বন্ধ না হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। এককথায় একে বলে 'ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি'। 'স্বতন্ত্রীকরণ' মানে আলাদা করা। গণতন্ত্র যাতে বলবৎ থাকে, তার জন্যই এই নীতি নেওয়া হয়। ফ্রান্সের দার্শনিক মন্তেস্কু প্রথম এই নীতির কথা বলেন।

ভারতের জনগণ শুধু শাসক নির্বাচন করেন না, নিজেরাও শাসনে অংশ নেন। সরাসরি শাসনে অংশ নেওয়াকেই বলে 'স্বায়ত্তশাসন'। 'স্ব' মানে নিজের আর 'আয়ত্ত' মানে অধীন। জনগণ যেখানে নিজেই নিজের অধীন সেই শাসন ব্যবস্থাকে বলে 'স্বায়ত্তশাসন'। পশ্চিমবঙ্গে এই স্বায়ত্তশাসন দু-ভাবে দেখা যায়। শহর বা নগরের ক্ষেত্রে পৌরসভা, আর গ্রামের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত।

ছোটো ছোটো শহরে বা নগরে পৌরসভা আছে। 'পৌর' কথাটা এসেছে 'পুর' থেকে। সংস্কৃতে পুর মানে নগর। ঐ শহর বা নগরের আঠারো বছর বা তার বেশি বয়সের বাসিন্দারা ভোট দিয়ে পৌরসভার সদস্যদের বেছে নেন। এঁদের পৌরপ্রতিনিধি বলে। এঁদের মধ্যে একজন পৌরপ্রধান হন। শহর বা

বলোতো, বর্তমানে ভারতের সরকার যদি হয় গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, তাহলে সুলতানি ও মুঘল যুগে ভারতের সরকার কেমন ছিল?

নগরের জনসেবা, জনস্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও প্রশাসন এগুলির দেখভাল করাই পৌরসভার কাজ। পানীয় জল সরবরাহ করা, রাস্তাঘাট বানানো, দূষণ রোধ করা, এসবই পৌরসভাগুলি করে থাকে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি বানিয়ে শিক্ষার প্রসারে ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে পৌরসভাগুলি উদ্যোগ নেয়।

শহর বা নগরে পৌরসভার মতোই গ্রামে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের বসিন্দারা ভোট দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নির্বাচন করেন। তাদের মধ্য থেকে একজন হন পঞ্চায়েত প্রধান। গ্রামের সবরকম উন্নতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ। পানীয় জলের সরবরাহ, গ্রামের পরিচ্ছন্নতা, পথ-ঘাট নির্মাণ এসবই গ্রাম পঞ্চায়েত করে। আবার শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় করা, চিকিৎসা কেন্দ্র তৈরি করা, বনসৃজন করা— এসবও গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের মধ্যে পড়ে।

অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে একটা 'ব্লক' হয়। সেই ব্লকে একইভাবে একটা পঞ্চায়েত সমিতি থাকে। আবার কয়েকটি ব্লক নিয়ে হয় 'জেলা'। জেলায় থাকে জেলাপরিষদ। গ্রামের মতোই ব্লক ও জেলার স্বায়ত্তশাসনের ভার থাকে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাপরিষদের উপরে।

পৌরসভা হোক বা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা—সবেতেই পাঁচ বছর অন্তর জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। আবার এই দুই ক্ষেত্রেই নানাভাবে জনগণ নিজেরাও শাসনব্যবস্থা ও নানা কর্মসূচিতে অংশ নেন।

এভাবেই জনগণের সরাসরি যোগদানের মধ্যে দিয়েই শহর বা নগর ও গ্রামের গণতন্ত্র জোরদার হয়ে ওঠে।

তুমি পৌরসভা এলাকায় থাকো না পঞ্চায়েত এলাকায় থাকো? তোমার এলাকায় কি বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে? কতগুলি খেলার মাঠ বা পার্ক আছে? কীভাবে তোমরা পানীয় জল পাও? বন্ধুরা সবাই মিলে এসবের খোঁজ নিয়ে নাও।

টুকরো কথা

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র ব্যাপারটা কিন্তু নতুন ধারণা নয়। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের কথা। গ্রিস দেশে এথেন্সের লোকেরা তাদের মধ্য থেকে শাসক বেছে নিত। শোনা যায় যে, লোকেরা ভাঙা কলসির টুকরোর উপর পছন্দমতো চিহ্ন এঁকে আরেকটা আস্ত কলসির মধ্যে ফেলে দিত। যার পক্ষে বেশি কলসির টুকরো জমা পড়ত, সেই হতো শাসক।

একটা পৃথিবীর মানচিত্র নাও। এবার তার মধ্যে থেকে গ্রিস ও এথেন্স খুঁজে বের করো।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) (বাংলাদেশ/জাপান/ফ্রান্স) _____ এ এখনও রাজা-রানি আছেন।

(খ) নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে শাসক নির্বাচনের পদ্ধতিকে বলে _____ (গণতন্ত্র/রাজতন্ত্র/যুক্তরাষ্ট্র)।

(গ) (ভারতের/জাপানের/ইংল্যান্ডের) _____ সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম সংবিধান।

(ঘ) জনগণ যে শাসনব্যবস্থায় নিজেই নিজের অধীন, তাকে বলে _____ (সংবিধান/সভা ও সমিতি/স্বায়ত্তশাসন)।

(ঙ) অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে হয় একটা _____ (ব্লক/জেলা/পৌরসভা)।

২। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :

'ক' স্তম্ভ	*'খ' স্তম্ভ*
সরকার	গ্রিস
ড. বি.আর. আম্বেদকর	স্বায়ত্তশাসন
যুক্তরাষ্ট্র	ভারতীয় সংবিধান
এথেন্স	ফারসি
জেলাপরিষদ	ভারত

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) বর্তমান ভারতে শাসনব্যবস্থার কী কী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

(খ) যুক্তরাষ্ট্র ও সংবিধান কাকে বলে?

(গ) সরকারের কাজ কী কী?

(ঘ) স্বায়ত্তশাসন বলতে তুমি কী বোঝো?

(ঙ) নির্বাচনকে সাধারণ ভাবে কী বলে? ভারতে কত বছর অন্তর সরকার নির্বাচন হয়? সরকার নির্বাচনের সঙ্গে গণতন্ত্রের কী সম্পর্ক?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) ভারতকে কেন গণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা হয়? দেশ পরিচালনায় সংবিধানের ভূমিকা কী বলে তুমি মনে করো?

(খ) সরকারের কয়টি ভাগ? ঐ ভাগগুলি কোনটি কী কাজ করে? বিচার বিভাগকে কেন আলাদা করে রাখা হয়?

(গ) পৌরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কী কী কাজ করে?

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বিষয়ে একটি টীকা লেখো।

(ঙ) প্রাচীনকালে ভারতে ও অন্য কোথাও গণতন্ত্রের কথা জানা যায় কী? সেই গণতন্ত্র কেমন ছিল বলে তুমি মনে করো?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

(ক) ধরো তুমি একজন পৌর-প্রতিনিধি/পঞ্চায়েত সদস্য। তোমার স্থানীয় অঞ্চলের উন্নতি করার জন্য তুমি কী কী কাজ করবে, শ্রেণিকক্ষে যুক্তিসহ একটি বক্তৃতা পেশ কর।

(খ) ধরো তুমি ভারতের একজন সাধারণ মানুষ। তুমি তোমার অঞ্চলের উন্নতি করতে চাও। কী কী ভাবে তুমি সেই উন্নতির পরিকল্পনা করবে, শ্রেণিকক্ষে যুক্তিসহ একটি বিতর্কের আয়োজন কর।

(গ) ধরো পাল যুগের বাংলার একজন সাধারণ লোকের সঙ্গে তোমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছে। তোমরা রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এসব নিয়ে গল্প করছো। তোমাদের সেই কথাবার্তা নিয়ে সংলাপ লেখো।

বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে *পড়ার মাঝে মজার কাজ* ও *ভেবে বলো* শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর *কল্পনা করে লেখো* শীর্ষক *কৃত্যালি* গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে *প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন* (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

শিখন পরামর্শ

- পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির সপ্তম শ্রেণিতে পঠন-পাঠনের জন্য *অতীত ও ঐতিহ্য* বইটি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে উপস্থাপিত করা হলো।
- বিগত ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখার (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫) নির্দেশ অনুযায়ী এই বইয়ের বিষয় প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, ছবি এবং মানচিত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষের মধ্য যুগের ইতিহাসের (আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত) নানা দিক এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিত মনে রেখে এই বইতে বাংলার ইতিহাসের ওপর আলাদা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (বিশেষত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে)।
- এই বইটি ন-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে নবম অধ্যায়ের দিকে ধারাবাহিক ভাবে এগিয়ে যেতে পারে। অথবা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্যভাবেও অধ্যায়গুলি সাজিয়ে নিতে পারে। যেমন পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং অষ্টম অধ্যায়গুলি একসঙ্গে পড়া যেতে পারে।
- বইয়ের মূল ধারাবিবরণীর পাশাপাশি ১০০টি 'টুকরো কথা' শীর্ষক অংশে আলাদা করে নানা তথ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। এসবই আগ্রহী শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য রাখা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারবেন, তাদের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করতে পারবেন। তবে নিরন্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলিকে পরিহার করে চলাই ভালো। এই অংশগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যাবে না। কল্পনাধর্মী ও তুলনামূলক আলোচনায় সেগুলি কাজে লাগানো যেতে পারে। এর মধ্যে ১১, ১৩, ১৫, ৩৯, ৫০, ৭৩, ৮৪, ৮৬, ১১৮, ১১৯ এবং ১৬২ পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা' অংশগুলিকে ব্যতিক্রমী বলে ধরতে হবে। এগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যেতে পারে।
- প্রতি পাতার এক পাশে শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা রইল। তাদের ভাবনাচিন্তা তারা সেখানে লিখে রাখবে। আশা রইল প্রথম দিনেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করে দেবেন।
- বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি দিয়ে এক-একটি যুগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে। যেমন, চতুর্থ অধ্যায়ে দিল্লি সুলতানির সম্প্রসারণের কোনো ধারাবিবরণী না দিয়ে কেবল একটি মানচিত্রে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে দুটি রেখচিত্রের সাহায্যে মধ্যযুগের ভারতের বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কথা এবং ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানির আমদানি-রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
- এই বইটির একটি বড়ো সম্পদ এর ছবিগুলি। ছবিকে সব সময়েই ধারাবিবরণীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। ছবিগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন চিত্র নয়, এগুলি মূল ধারাবিবরণীরই অঙ্গ।
- ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তার সাল-তারিখ। এই বইতে শিক্ষার্থীদের নীরস ভাবে সাল-তারিখ মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হয়নি। রাজা-বাদশাহের নামের তালিকা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করবে এমন কোনো দাবিও আমাদের নেই। সাধারণভাবে শাসক বংশগুলির বিশদ এবং ধারাবাহিক ইতিহাসের বিবরণ এখানে বাদ রাখা হয়েছে। তবে কালানুসারে ইতিহাসের পরিবর্তনের একটি ধারণা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার জন্য কোনো একটি কালপর্বের মূল দিকগুলিকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- পঠন-পাঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বছরভর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE)। এর জন্য প্রয়োজন নানা রকমের কৃত্যালি ও প্রশ্নের চয়ন। অধ্যায়ের ভিতরে পড়ার মাঝে মজার কাজ ও ভেবে বলো শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর কল্পনা করে লেখো শীর্ষক কৃত্যালিগুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে নমুনা অনুশীলনী— 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো' দেওয়া আছে, যার আদলে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ নিজেরাই প্রশ্নসম্ভার তৈরি করে নিতে পারবেন। এই অনুশীলনীগুলি সেই কাজে দিক নির্দেশ করছে মাত্র। মানচিত্র এবং ছবি দিয়েই সরাসরি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের সামনে। প্রথম অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন অনুশীলনীতে রাখা হয়নি। মূল্যায়নের সময় এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন রাখা যাবে না। প্রত্যেক অনুশীলনীতে 'কল্পনা করে লেখো' অংশে কয়েকটি কাল্পনিক প্রশ্ন রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশক্তিকে পরখ করা। তবে মূল্যায়নের সময় এই অংশের প্রশ্নগুলি রাখা যাবে না।

- নীচে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা পাঠ্যসূচি দেওয়া হলো। প্রয়োজনে এই পাঠ্যসূচি শিক্ষক/শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতিটি পর্বের মধ্যে পাঠ্যবিষয় শিখন ও নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকে ধরে পর্ব বিভাজন করা হয়েছে : প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়/তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: অষ্টম ও নবম অধ্যায়/(**এক্ষেত্রে পূর্বের পর্যায়ক্রমিক শিখন সামর্থ্যকে পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে**)। (**বি.দ্র.: ১। প্রথম অধ্যায় থেকে পর্যাযক্রমিক মূল্যায়নে কোনো প্রশ্ন রাখা যাবে না।** ২। সপ্তম অধ্যায়টির শিখন-শিক্ষণ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যে করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে করতে হবে।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে। চতুর্থ অধ্যায়ে সেই রকম একটি দিকনির্দেশ করা হয়েছে।